অন্তর্গত খেলা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ANTARGATA KHELA

(Novel)

by

Atin Bandyopadhyay

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : দেবদত্ত নন্দী

প্রথম প্রকাশ
১লা জানুয়ারী, ১৯৬০

হেমন্তের এক সকালে নিখিল বের হয়ে পড়ল। গায়ে বেশ ঠাণ্ডা লাগাতেই নিখিলের মনে হয়েছিল হেমন্ত এসে গেছে। সামান্য শীতে হাঁটতে খারাপ লাগছিল না। সে সোজা মেস থেকে হেঁটেই চলে এসেছে। একটু অপেক্ষা করলে ট্রাম বাস পাওয়া যেত। সে ট্রাম বাসের জন্য অপেক্ষা করেনি। হাতে সময় নিয়ে বের হয়েছে। এসপ্লানেডে হেঁটে গেলেও সে বাস ছাড়ার আগেই পৌঁছাতে পারবে।

সে পৌঁছে দেখল কার্জন পার্কের আশেপাশের গাছপালাতে এখনও হেমন্তের কুয়াশা লেগে রয়েছে। ধোঁয়ার মত অথবা হালকা সেলোফেনের এক অতিকায় কাগজ কেউ যেন উড়িয়ে দিয়ে গেছে। ট্রামের তারে সে দুটো একটা পাখিও দেখতে পেল। সকাল বলে লোকজন কম, মানুষের ব্যস্ততা কম—কেমন অন্য রকম চেহারা। কোন ভিড় নেই। হাতে এখন সময় আছে। বাস ছাড়বে সাতটায়। সে ঘড়িতে দেখল, এখনও পনের মিনিট বাকি। আগেই টিকিট কাটা। সুতরাং সে বাস-গুমটিতে ঢুকে যাবার মুখে ক্যান্টিনে ঢুকে এক কাপ চা, দুটো টোস্ট এবং একটা হাফ-বয়েল ডিম খেয়ে নিল। তারপর কিনল একটা দৈনিক কাগজ। কাগজটা সে বাসে যেতে যেতে পড়বে।

এবং এই কোথাও যাবার সময়, তার কিছু বই-টই সঙ্গে থাকে। এবারে কি-ভেবে সঙ্গে কোন বই নেয় নি। অথবা এও হতে পারে—এবারের কাজগুলি খুব ঝামেলার, অনেক চিন্তা ভাবনা মাথায় আগে থেকেই ঘুর ঘুর করছিল—ঠিক যতটা হালকা থাকলে গল্পের বইয়ে মন দেওয়া যায় এবারে তার কিছুটা যেন ব্যতিক্রম।

সে টিকিটটা বের করে নম্বর দেখল। উত্তরবঙ্গে পাড়ি দেবে বলে

নীল রঙের বাসগুলি একে একে গুমটিতে ঢুকছে। সাড়ে সাতটায় যে গাড়ি ছেড়ে যাবার কথা, সেগুলি আসবে সাতটায়। সুতরাং গাড়ি ছাড়তে আরও আধ ঘণ্টা। এই আধ ঘণ্টা সময় সাধারণতঃ তার যে-ভাবে কাটাবার অভ্যাস, পায়চারি করে, কখনও সুন্দরী মেয়েদের দিকে তাকিয়ে···আর ঠিক খুঁজে খুঁজে এই বাসস্ট্যাণ্ডে সে একজন সুন্দরী মেয়েকেও আবিষ্কার করে ফেলল। আশ্চর্য লাবণ্যময়ী যুবতী, হাতে ছোট্ট সুটকেশ, ভারি মায়াবী দুটো চোখ নিয়ে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। নিখিল ভাবল, সময় কাটাবার পক্ষে বেশ মেয়েটি। মেয়েটির দু-একটি চুল কপালে ফুর ফুর করে উড়ছে। এবং নাভির সামান্য নিচে শাড়ি পরেছে বলে আরও বেশি লম্বা দেখাচ্ছে। তার মনে হল, কলকাতায় এবার যথার্থই হেমন্ত এসে গেল। হেমন্তের মাঠে মেয়েটিকে কেমন দেখাবে না জানি।

রায়গঞ্জের বাসে তার সিট রিজার্ভড্। সে আজকাল দেশ গাঁয়ে যেতে হলে বাসেই যায়। ট্রেন বড় দেরি করে। এবারে কিছু অফিসের কাজ নিয়ে যাচ্ছে। বলতে গেলে তার এটা রথ দেখা কলা বেচার মত।

কলকাতা থেকে নিখিলের বাড়ি খুব দূরেও নয়, আবার কাছেও নয়। এই দূর-কাছের জায়গায় বাসে যেতে বড় ভাল লাগে। চার পাঁচ ঘণ্টার মত পথ। বেশ আয়েস করে যাওয়া যায়। বাসেই বেশী সুবিধা এটা তার মনে হয়েছে।

বেশ মাঝামাঝি জায়গায় সিট। ফলে সামনে টায়ারের উঁচু জায়গাটা—পা রেখে বসা যাবে। বসার পর মনে হল বেশ আরাম। জানালার কাছে বলে চারপাশের সবুজ শস্যক্ষেত্র সহজেই সে দেখতে পাবে। এবং কিছুটা বিলাসী মানুষের মত সে তার অ্যাটাচিটা রাখল ওপরের র‍্যাকে। তারপর পা ছড়িয়ে বসতেই দেখল, পাশের সিটে সেই মেয়েটি। তিনজনের সিট। সে জানালার ধারে, তারপর মেয়েটি, তারপর কেউ। এত কাছাকাছি মেয়েটিকে সঙ্গে পাবে সে ভাবতেই পারেনি। এবং স্বপ্ন সত্য হলে যা হয়, নিখিলের মনে হল, বেশ জমবে। সারা রাস্তাটা মনে হবে দু' দণ্ডের পথ। এবং পাশে বসতেই সে এবার

খুব কাছ থেকে দেখল—সত্যি বড় বেশী লাবণ্যময়ী। নীলাভ শাড়ির রং, উঁচু খোপা বাঁধা। সারা শরীরে যেন বড়ই অহমিকা। তারপর পাশে সেই যুবা মত, বেশ কম বয়সেরই যুবা বলা চলে—কেউ ওর হবে হয়তো। এবং যুবাটির চুল নিদারুণ বড় করা। আর ঘাড়ে গলায় মানানসই বলে নিখিল ভাবল যুবতী না তরুণী বলবে পাশের লাবণ্যময়ীকে! লাবণ্যময়ীর সঙ্গে যুবার কোন বৈধ সম্পর্ক আছে বোধ হয়।

আর তখনই নিখিলের ভেতরটা কেমন চুপসে গেল। অথচ মানুষের মনে যে কি থাকে। সে ভেতরে ভেতরে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। একজন পুরুষ মানুষ পাশে বসলে যা হয়, একজন মেয়ে বসলে ঠিক তা হয় না, অন্য কিছু হয়, এই কিছু হওয়াটার মধ্যে নিখিল অক্লেশে ডুবে যেতে চাইল। সে মেয়েটার শরীরের ঘ্রাণ পর্যন্ত পাচ্ছিল। কোন হিমেল শীতের রাতে সবুজ গাছপালার মত গন্ধটা।

বেশ মনোরম জার্নি। ভ্রমণে এমন নারী সুধাপারাবার—যদিও সে বেশী বেশী ভাবছে, তবু এটা মানুষের হয়। সে এমন সুযোগ যে এই প্রথম পেয়েছে তা নয়, আরও পেয়েছে—যতবারই পেয়েছে ততবারই শরীরের কোথাও বিদ্যুৎ প্রবাহ আছে সে টের পায়। সে আজও টের পেল, শরীরের বিদ্যুৎ প্রবাহ ঠিকই আছে। যেন অতীব একটা সূক্ষ্ম মিউজিক কলকাতার আকাশে বাতাসে বাজছে। আর মনে হচ্ছিল, বাসটা বেশ দ্রুত যাচ্ছে। এবং এই প্রথম মনে হল, এত দ্রুত বাসে যেয়ে কি দরকার। কার কোথায় এমন কাজ পড়ে আছে যে বাস দ্রুতগামী না হলে সব পণ্ড হবে।

তারপর নিখিল জানালায় হাত রেখে বাইরের পৃথিবী দেখল। সকাল বেলাটা শহরের চেহারা একেবারে অন্যরকম। শহরটা যেন হাই তুলছে। অথচ দুপুরের কলকাতায় মানুষ হাই তোলে ভাবাই যায় না। দোকান পাট, মানুষ জন, রেশনের দোকান, একটা ব্রিজ, দুটো বাঁক, বড় একটা সিনেমা হল পার হয়ে যেতেই নিখিল দেখল শহরের সেই বড় রাস্তা। এই রাস্তায় এলে মনেই হয় না, কলকাতা ঘিঞ্জি শহর,

কলকাতা গরিবের শহর। পাশের মেয়েটি এখন কোন দিকে তাকিয়ে আছে, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ভারি সুন্দর স্তন। কারণ হাওয়ায় শাড়ি উড়ছিল। সে দেখেছে নিটোল এবং গভীর। আর তারপরেই যা হয়ে থাকে যুবক মাত্রেই, যুবক বলে কেন, পুরুষ মাত্রেই। মেয়েটির সর্বাঙ্গ বড় খোলামেলা এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে নিখিল নামে এক যুবক। মেয়েটি হেমন্তের মাঠ ভেঙ্গে যাচ্ছে, নিখিল নামক যুবক ছুটছে। সুন্দরী মেয়েদের দেখলে নিখিলের এটা হয়। মনে মনে সে মেয়েটার সব কিছু দেখে নেয়।

অথচ নিখিলকে কে ভাববে, মনের সাম্রাজ্যে এমনতর সব কথাবার্তা হয়ে থাকে। সে বরং অন্যমনস্ক—তাকে দেখলে এমনই মনে হবে। সে সিগারেট খাচ্ছিল—আর বাইরের দিকে তাকিয়ে কি দেখছে। পাশে কোন যুবতী আছে মুখের অবয়বে তার বিন্দুমাত্র যদি প্রকাশ থাকে। কেমন গভীর এবং গম্ভীর। কেউ পাশে থাকলে যেন বলত, কলকাতা শহরে এমন একটা প্রকাণ্ড রাস্তা, আর এত সুন্দর ঘরবাড়ি আছে কে বলবে। এমন কি সে রাজনীতি নিয়েও দুটো একটা কথা বলতে পারে কিন্তু মেয়ে সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা মাথার ঘিলুতে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, মুখ চোখ দেখলে এতটুকু আঁচ করা যাবে না। বড়ই নির্বিকার। আসলে নিখিল জানে সে খুব ইমোশনাল। একটুতেই ভারি চাঞ্চল্য জাগে। তার এইটুকুই আছে। তারপর আর বেশীদূর এগোতে পারে না। মুখচোরা স্বভাবের মানুষদের যা হয়ে থাকে। আসলে সে জানে, সে একটা মস্ত বড় কাপুরুষ।

আর তখনই নিখিল লক্ষ্য করল, ফ্লাক্স থেকে কাপে কিছু ঢালছে মেয়েটি। সম্ভবতঃ চা। গাড়ির ঝাঁকুনিতে তার জামাকাপড়ে চা পড়তে পারে ভেবে সে একটু গুটিয়ে বসতে গিয়েই দেখল, চা না, জল। এবং হাতে সোনালী রঙের দুটো ট্যাবলেট। মেয়েটি কাপ থেকে জল মুখে নিল, তারপর দুটো ট্যাবলেট মুখে ফেলে দিল। বাসে উঠলে কারো নসিয়া হয়, নসিয়া কাটাবার জন্য হয়ত এই দুটো ট্যাবলেট। খাবার সময় মেয়েটি ওর দিকে আড়চোখে তাকাল। নিখিল অন্যদিকে চোখ

ঘুরিয়ে নিল। যেন সে কিছুই দেখেনি। আর তা ছাড়া এমন ভাব দেখাল নিখিল, যেন এ সব দেখার তার সময়ও নেই। কাগজটা এরপর মুখের সামনে মেলে ধরল। এবার কাগজটা মুখের সামনে রেখে মেয়েটির মুখ চোখ গলা, মসৃণ বাহু, সে গোপনে সুবিধাজনক জায়গা থেকে মাঝে মাঝে দেখবে বলে মন দিয়ে খবর পড়া শুরু করে দিল। প্রথমেই বড় হরফে লেখা—ময়দানে বজ্রপাত, তিন কিশোরের জীবনান্ত। তারপরই আছে—নবজাতক নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ এবং পৃথিবীর প্রথম অযোনিসম্ভবা মানব শিশুটি কন্যা। বাসের দু এক জন যাত্রী টেস্টটিউব বেবি নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ আলোচনা শুরু করে দিয়েছিল।

নিখিলের মনে হল, এটা অসভ্যতা। কারণ এই বাসে কিছু মেয়ে যাত্রী রয়েছে। মেয়েদের সামনে এতটা উলঙ্গ কথাবার্তা ঠিক শোভা পায় না। পাশের মেয়েটি আবার ফ্লাস্ক থেকে জল ঢালছে এবং আরও দুটো ট্যাবলেট খেয়ে ফেলল। মুখটা ভারি বিষাদে ভরা যেন। ট্যাবলেট খেয়েই চোখ বুঁজে মাথা এলিয়ে দিচ্ছে। এবং অতলে ডুবে যাচ্ছে যেন। পরপর ক'টা ট্যাবলেট খাওয়ায় নিখিল সামান্য অবাক হল। একটা দুটো খাওয়া যায়, কিন্তু পরপব এবং গোপনে এ ভাবে মেয়েটির ট্যাবলেট খাওয়া কি রকম একটা সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিল তাকে। পাশের যুবকটি কিছুই লক্ষ্য করছে না। যেন পরিচয় নেই—না কি বাসে ওঠার আগে মান অভিমানের পালা চলেছিল। এখনও সেটা বোধ হয় কাটেনি।

গাড়িটা ক্রমে উল্টাডাঙ্গা ব্রীজ পার হয়ে চলে গেল। দুপাশে ফেলে চলে যাচ্ছে সল্ট লেক, লেক-টাউন। সুন্দর সব মাঠের ওপর কত রঙবেরঙের দালান কোঠা। এবং এভাবে ক্রমে এয়ারপোর্ট ডান পাশে ফেলে এক ধাক্কায় গাড়িটা এসে পড়ল সবুজ মাঠের ভিতর। ঠিক সবুজ বলা যাবে না—জমিতে সব ধানের শিষ, বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ এবং কুয়াশার হালকা ধূসর ছায়া ছায়া ভাব, একটা গাঢ় নীলাভ উজ্জ্বল হলুদ রঙ সৃষ্টি করছিল মাঠে মাঠে। এবং নিমেষে সব ফেলে গাড়িটা ছায়া ছায়া এক অন্ধকারে ঢুকে যেতেই নিখিল দেখল, সামনে বারাসাত।

দুচার বার এ রাস্তায় সে গেছে বলে সবই প্রায় জানা হয়ে গেছে—কোথায় মোড়, কোথায় সেই বুড়ো লোকটা বসে ঝিমোয় এবং বিড়ি বাঁধে, কোথায় মিষ্টির দোকানে লেখা—এখানে সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায়। তার কিছু কিছু সাইনবোর্ড পর্যন্ত মুখস্থ।

বারাসাতেই এসে প্রথম গাড়িটা থামে। এখান থেকে উঠল দুজন লম্বা মত মানুষ এবং একজন বেঁটে মত মেয়ে। উঁচু হিলের জুতো পরেও শরীর লম্বা করতে পারে নি। মেয়েটির এই দুরবস্থায় নিখিলের হাসি পেল। আর তখনই মনে হল পাশের মেয়েটি নড়েচড়ে বসছে—কেমন উসখুস করছে। সে তাকালে বুঝত, মেয়েটির মধ্যে কি যেন অস্বস্তি। চোখ দুটো বুজে আসছে—কিছুটা মাতালের মত ভান করে চোখ মেলে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না। নিখিল একটু সরে বসল। এবং মেয়েটিকে সামান্য জায়গা করে দিল। হয়ত পা মেলে বসতে পারলে যদি অস্বস্তি কেটে যায়। তারপরই লক্ষ্য করল সিটে মাথা রেখেছে। ঘুমোবার চেষ্টা করছে। নিখিল বুঝল, আসলে মেয়েটির এখন কিছুই ভাল লাগছে না। চোখ বুজে পড়ে আছে। সারা মুখ কেমন লাল মেয়েটির। এখন মেয়েটি এত গম্ভীর এবং বিষণ্ণ যে তাকে নিখিল মেয়ে না ভেবে যুবতী ভাবল। যুবতী মেয়েরা কখনও কখনও মুখ এমন গম্ভীর করে রাখতে ভালবাসে।

যুবতীকে ভাল করে দেখতে গেলে নিখিলের বেশ ঘাড় ঘোরোতে হয়। দু একজন বাসের যাত্রী আবার এটা লক্ষ্য করে মনে মনে মজা না পায়। সে সেজন্য খুব সতর্ক নজর রাখছে চারপাশে। তাকাবার সময় লক্ষ্য রাখছে কেউ তাকে দেখছে কিনা। এবং পাশে যুবতী মেয়ে নিয়ে কবে কার আর মন মেজাজ ঠিক থাকে।

নিখিল অবশ্য কোন দূর যাত্রায় এমন সঙ্গী পেলে ভীষণ খুশী হয়। কারণ মাঝে মাঝে চোখে চোখ পড়ে গেলে দেখেছে গোপনে দুজনের চোখে লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হয়ে যায়। নিখিল যেহেতু লম্বা এবং সুন্দর ছিমছাম চেহারার মানুষ সেজন্য মেয়েরাও ওকে চুরি করে দেখতে ভালবাসে। গোপনে এই প্রেম প্রেম খেলা জীবনে কতবার যে ঘটেছে।

যদিও বড়ই ক্ষণিকের তবু এটা তার ভাল লাগে। কিন্তু আশ্চর্য, এতক্ষণ পরেও যুবতী তার দিকে একবারও ভাল করে তাকায়নি। তাকায়নি বললে ভুল হবে, পাশে যে একজন সুন্দর পুরুষ মানুষ বসে আছে তাও যেন যুবতী টের পায়নি।

বাসে আর যারা যাচ্ছিল তারা অধিকাংশই রায়গঞ্জের যাত্রী। কিছু মালদহে নামবে। কিছু বহরমপুরে। দু পাশে গ্রাম গঞ্জ ফেলে যাবার মধ্যে একটা আয়াস আছে। নিখিলও মাথা এলিয়ে দিযে বাইরের শস্যক্ষেত্র দেখতে থাকল। তিনজনেব বসার সিট আরও একটু প্রশস্ত হলে যেন একটু বেশী ভাল হত। যুবতী আরও একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতে পারত। যে অস্বস্তিটুকু মুখে লেগে আছে সিট প্রশস্ত হলে সেই অস্বস্তিটুকুও হয়ত থাকত না। জমত ভাল। এবং এ সময়ই যুবতীর নাম জানার ভারি আগ্রহ হল তার। পাশের যুবকের সঙ্গে কি সম্পর্ক তার, দু'ঘণ্টা বাস চলার পরও কেন তারা কথা বলছে না, এসব জানার জন্য মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন—যেমন কোথায় যাবে, যদি বহরমপুর যায় তবে কোন্ অঞ্চলে—এ সবই মনের মধ্যে কাজ করছে। সে যে বিশেষ কাজে যাচ্ছে বহরমপুরে এবং কাজ হলে সে তার নিজের বাড়িতে চলে যাবে—সেখানে মা বাবা আছেন, ভাই বোনেরা আছে, তাদের সঙ্গে ক'টা দিন, এসব কিছুই আর এখন মাথার মধ্যে নেই। মেয়েটির মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক বিষয় লক্ষ্য করছে। চুপচাপ, চোখ বুঁজে পড়ে থাকা, মাঝে মাঝে হাই তুলছে—যেন কোন দূর গ্রহে পাড়ি দেবে ভেবে ভয়ে কেমন মুখ বিবর্ণ করে রেখেছে।

আসলে সবই হয়তো নিখিলের মনগড়া। কোন রহস্যই হয়তো নেই—নিতান্তই সাদামাটা ব্যাপার। সে নিজের মনে অলস কল্পনা করতে ভালবাসে বলে, মেয়েটির মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার স্যাপারের গন্ধ পাচ্ছে।

এক সময় নিখিলের কেন জানি মনে হল মেয়েটি বহরমপুরেরই মেয়ে। সে তাকে আরও যেন দেখেছে। নিখিল নিজেও বহরমপুরের ছেলে। স্কুল কলেজের পাঠ বলতে সবই তার বহরমপুরে। আর যা

হয়, মেয়েদের দিকে ক'বার তাকালেই সে দেখেছে কখন মনে হয়ে যায় যুবতী তার চেনা। নিখিল এমন ভেবে আবার নিজের মনেই হাসল। আসলে সে বুঝতে পারে পৃথিবীতে যুবকদের এমনই স্বভাব। যা কিছু সুন্দর সব কিছু নিজের ভেবে সুখ পাওয়া।

এখন দু-পাশে শুধু আদিগন্ত মাঠ। কোথাও মাঠে গভীর নলকূপ থেকে জল উঠে আসছে। বোধ হয় পাটের জমি ছিল—মরশুমের পাট চাষ শেষে আলুর চাষ। এখন হেমন্তকাল বলে জলের টানাটানি আছে। চাষীরা নলকূপ থেকে জল নিয়ে জমি ফের চাষ আবাদের যোগ্যি করে তুলছে। অসময়ের ধান বোনাও হতে পারে। ঠিক কি চাষ হবে সে কিছু জানে না। তারপর শুধু ধানের জমি, কিছু পাখি উড়ে যাচ্ছে। কিছু গরুবাছুর মাঠে। আলে বসে একজন রাখাল বালক ঘাস কাটছে। নদীর জলে পাট কাচা হচ্ছে কোথাও। রোদের তাজা রুপালী রঙ আকাশে বাতাসে।

মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিখিলের চোখ বেশ টাটাচ্ছে। একবার মুখ ঘুরিয়ে মেয়েটিকে দেখতে পারলে আবার ভাল লাগত। সুন্দরী মেয়েদের শরীরে মুখে কি যে থাকে! যেন বারবার দেখেও আশ মেটে না। অথবা এই যে দ্রুতগতি যান, একেবারে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, থামা নেই, হাওয়ার ঝাপটায় চুল উড়ছে এবং মুখে কপালে ওর বড় বড় চুল লেপটে যাচ্ছে। মেয়েটির যেন তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। বেশ শীত শীত করছিল। কাচের জানালাটা তুলে দেবার সময় মনে হল তার উরুতে কেউ হাত রেখেছে।

নিখিল এবার চোখ ফিরে তাকাল। মেয়েটির হাত ওর উরুর ওপর। বাসের ঝাঁকুনিতে মেয়েটি কেমন বেসামাল হয়ে পড়ছে। ঠিকমত বসে থাকতে পারছে না। ভীষণ দুলছে। উরুতে হাত রেখে কিছুটা টাল সামলে নিচ্ছে যেন। এবং চোখ তেমনি বোঁজা। কোথায় হাত রেখেছে সে বুঝি তাও জানে না। চোখ মেলে তাকালে মেয়েটি ভীষণ সঙ্কোচের মধ্যে পড়ে যাবে। সে ধীরে সন্তর্পণে উরু থেকে মেয়েটির হাত নামিয়ে দিল। যাতে টের পেয়ে লজ্জায় না পড়ে যায়। অথচ মেয়েটি তখনও

তার দিকে তাকাল না। কি সুন্দর নরম হাত। আঙুলগুলো চাঁপা ফুলের মত মিহি এবং নরম। আর কি ঠাণ্ডা হাত। এমন সুন্দর নরম হাত, তার ইচ্ছে একটু টিপে টিপে দেখে। কিন্তু তখনই দেখল মেয়েটির নাক কেমন ফুলে ফুলে উঠছে। মুখে ভারি কষ্টের ছাপ। এবং যেন সামান্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে নিখিলের কাছে কিছু চাইছে।

সে আর পারল না। পাশের যুবকটিকে তার খুবই নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে। সে মেয়েটির শরীরে সামান্য নাড়া দিয়ে বলল, আপনার কি খুব শরীর খারাপ ?

মেয়েটি কোন সাড়া দিল না। তার দিকে চোখ মেলে তাকালও না। ঠিক যেমনি পড়েছিল কলকাতা থেকে, ঠিক তেমনি পড়ে আছে। মাথাটা শরীর থেকে কিছুটা হেলে পড়েছে। বাসের ঝাঁকুনিতে মুখটা কাঁপছে—সেই প্রতিমা বিসর্জনের মত। লরিতে ওরা যখন প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য নিয়ে যেত, সে দেখেছে, দেবীর সেই কাজল-লতা মুখ এ-ভাবে গাড়ির ঝাঁকুনিতে কাঁপত। এবং যা হয় এভাবে সে দেখতে পায় কোথায় যেন বিসর্জনের বাজনা বাজছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। দুহাতে ধুনুচি। ধূপের ধোঁয়ায় এবং গন্ধে চোখে জল এসে গেছে।

এবারে নিখিল আর পারল না। যুবকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, কোথায় যাবেন ?

যুবকটি বলল, ফারাক্কা।

—ওনার শরীর বুঝি ভাল নেই ?

যুবকটি নিখিলের কথা ঠিক ধরতে পারল না। শুধু তাকিয়ে থাকল।

নিখিল বুঝতে পারল না এমন কথায় যুবকটি আবার রুষ্ট হল কিনা। কারণ যুবকটি তার কথায় কোন জবাবই দিল না। বরং অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

এটা হয়, কারণ সেও দেখেছে একবার কি কারণে সে এই বহরমপুরের বাসেই যাচ্ছিল—ছোটপিসি বলেছিল, তুই যাচ্ছিস যখন বিনুকে নিয়ে যা। ক'দিন বেড়িয়ে আসবে। বিনুর স্বভাব ভারি মিষ্টি, দেখতে আরও মিষ্টি। বাসে কিছু মানুষ বিনু এবং তার সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটা

সম্পর্ক তৈরি করে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। এতে নিখিল সেই সব যাত্রীদের ওপর বেশ বিরক্তই হয়েছিল।

সুতরাং নিখিল ফের মাঠ দেখতে থাকল। মরুক গে। অযথা এতটা উতলা হওয়া তার পক্ষে ঠিক নয়। সে নিজেকেই শাসন করে বলল, তোমার বড্ড লোভ হে নিখিলবাবু! এত লোভ ভাল না।

এখন আর দু-পাশে মাঠ নেই—একটা লম্বা বাজারের ভেতর দিয়ে বাসটা যাচ্ছে। বাসের তেমন আব গতিও নেই। সামনে এক সারি গরুর গাড়ি এই দ্রুতগতি যানের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। ড্রাইভার বেশ দুটো একটা মানানসই খিস্তি ঝেড়ে দিচ্ছে ফাঁক বুঝে। আলু কচু কুমড়ো গাড়ি বোঝাই। ইতস্তত: সব ট্রাক রাস্তার দুধাবে দাঁড়িয়ে। মানুষজন, ঠেলাঠেলি এবং সব ঠেলে বাইরে বের হয়ে যেতেই বেশ মুক্তির নিশ্বাস নেওয়া গেল।

তারপর একটা ব্রীজ পার হয়ে গেল বাসটা। নদীর দু-পার এবং কিছু শস্যক্ষেত্র আবার ভেসে উঠল নিখিলের চোখে। যেন অনন্ত আকাশের নিচে তারা চলে যাচ্ছে। মেয়েটির সঙ্গে দুটো একটা কথা বলতে পারলে ভাল লাগত। যুবতীর প্রাণে কি এত কষ্ট? এ বয়সে যেন কোন কষ্ট থাকা যুবতীর মানায় না। গাড়িটা বাঁক নিয়েছে তখন। এবং সে বুঝতে পারছে শান্তিপুরে ঢুকে যাবার মুখে সেই ভাঙ্গাচোরা রাস্তাটায় এবার গাড়িটা ঢুকে যাবে। এবং গাড়িটা সারাক্ষণ ভয়ঙ্কর লাফাবে এবার। মেয়েটি কেন যে এত ঘুমোচ্ছে! ঘুমো'চ্ছে, না টলছে! বারবাব ঢুলে ঢুলে মেয়েটি তার ওপরে এসে পড়ছে। একটা হাত আবার উরুতে এসে পড়েছে। এবার আর তার কেন জানি ইচ্ছে হল না হাতটা সরিয়ে নিচে রাখতে। আশ্চর্য এক স্পর্শে মুখ অথবা রক্তের ভেতরে খেলা আরম্ভ হয়ে যায় তার। তারও চোখ বুঁজে থাকতে ইচ্ছে করে। কারণ তার ভাল লাগছিল বেশ। সে যেন খেয়ালই করেনি, এবং আরও উদাসীন দেখাবার জন্য সে সামান্য অন্যমনস্কের ভান করল। জানালার বাইরে তার চোখ, সে শুধু গাছপালা মাঠ এবং শস্যক্ষেত্র দেখছে। আর কিছুই দেখছে না। কে তার উরুতে হাত রাখল তাও দেখছে না।

এবং যুবতী তখন প্রায় তার ওপর ঢলে পড়েছে। সে যেন অবলম্বন যুবতীর। সে শরীরও সরিয়ে নিচ্ছে না। একটু সরে বসলেই যুবতী ঢলে নিচে পড়ে যাবে।

তখনই গাড়িটা ভাঙ্গাচোরা রাস্তায় পড়ে গেল। সবাই লাফিয়ে উঠল অনেকটা। মেয়েটা এমনভাবে পড়ে আছে যে নিখিল নড়তে চড়তে পারছে না। পাশের সিট থেকে কেউ কেউ দেখছে। ওদের হয়ত ধারণা, যুবতী নিখিলেরই কেউ হবে। সে বেশ বিব্রত বোধ করছিল। একবার সামান্য সে ঠেলেও দিল। বলল, ঠিক হয়ে বসুন। কিন্তু কেমন যেন যুবতীর হুঁস নেই। কিছুটা যেন চেষ্টা করল ঠিক হয়ে বসার, কিন্তু পারছে না।

আর গাড়িটা তখনও গড়িয়ে গড়িয়ে কখনও লাফিয়ে লাফিয়ে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। কোন যাত্রীই ঠিক হয়ে বসতে পারছে না। সবাই এর ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে। বাঙ্ক থেকে কার একটা অ্যাটাচি পড়ে গেল নিচে। প্রায় সব যেন ভেতরের লণ্ডভণ্ড করে দিতে চাইছে গাড়িটা। আর যতটা পারছে দ্রুত বেগে ভেসে যাচ্ছে মাঠের ওপর দিয়ে।

নিখিল আর পারছিল না। মেয়েটাকে আবার ঠিক হয়ে বসতে বলবে ভাবছিল। এভাবে ঘাড়ে একটা মানুষ নিয়ে কতক্ষণ পারা যায়! ভেতরে ভেতরে সে বিরক্ত হচ্ছে। কখনও মনে হচ্ছে ন্যাকামি। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে কী যে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে তাকে। দৃশ্যটা খুবই দৃষ্টিকটু। সে একবার চিৎকার করে যেন বলবে—আপনি কি অসুস্থ! আপনার শরীর কি ভাল নেই! আর তখনই কি আশ্চর্য, তার কোলের ওপর ঢলে পড়ে গেল মেয়েটি। নরম চুল, মুখে লালা কাটছে। সে দেখতে না দেখতে মেয়েটা সহসা কোলের ওপর বমি করতে থাকল। মেয়েটাকে ঠেলে তুলে দিয়ে সে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল। ঝাঁঝালো টক গন্ধ। জামা প্যান্ট ভেসে গেছে বমিতে। মেয়েটা পড়ে আছে সিটে—প্রায় অচৈতন্য। পাশের সেই যুবকও দ্রুত ছিটকে বের হয়ে গেল। নিখিল অসহায়ের মত চিৎকার করে উঠল কনডাক্টর, এদিকে আসুন। দেখুন কি হয়েছে! শীগ্‌গির আসুন।

এবারে সবারই চোখ পড়ল নিখিলের ওপর। জামা-প্যাণ্ট নোংরা—বমির ছোপ ছোপ দাগ—দুর্গন্ধ। কনডাক্টর সিট থেকে উঠে এসে দেখল। খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যেন। কোন বিস্ময় নেই চোখে। ভারি নিরুত্তাপ গলায় বলল, কিছু করার নেই। লম্বা বাস-জার্নিতে এমন হামেশাই হয়।

রাগে দুঃখে নিখিলের মনে হল ঘুসি মেরে সে এক্ষুনি কনডাক্টরের সব ক'টা দাঁত উড়িয়ে দেবে। সে যে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এতক্ষণ যুবতীর উত্তাপে সে বেশ উষ্ণ ছিল—এক মুহূর্তে কি যে হয়ে গেল। তিক্ততায় নিখিলের মুখ ভার। সে এখন মেয়েটার দিকে তাকাতেও পারছে না। এমন সুন্দর মেয়েটা নিমেষে কী ভীষণ কুৎসিত হয়ে গেল! এবং কিছু অমানবিক আচরণও করে ফেলল সে মেয়েটির সঙ্গে। কে আছে এর সঙ্গে? আপনাদের কেউ হয়? এই এই—আপনি কার সঙ্গে এসেছেন?

সবাই খুব ভালমানুষের মত চুপচাপ বসে থাকল, কেউ উঠে এসে দেখে গেল। কিন্তু কেউ কিছু হয় কিনা কোন সাড়া দিল না। কেউ স্বীকার করল না, মেয়েটির সঙ্গে সে আছে।

সে মুখ কাছে নিয়ে বলল, এই, আপনার সঙ্গে কে আছে?

কিছু বলার চেষ্টা করছে মেয়েটি, কিন্তু বলতে পারছে না।

—কোথায় যাবেন?

মেয়েটা সামান্য চোখ মেলে তাকাল। তারপর চোখ বুঁজে ফেলল।

—আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল!

কৌতূহলী বাসযাত্রীরা বলল, পড়ে থাকতে দিন। মাথা গোলাচ্ছে। কথা বলবে কি!

তবে কি মেয়েটা একাই বাস-ভ্রমণে বের হয়ে পড়েছে! সঙ্গে কেউ নেই? কোথায় যাবেই বা! সে এবার নুয়ে বলল, এই যে উঠুন। বসার চেষ্টা করুন। বমি করে সব তো ভাসিয়ে দিলেন। বাসে উঠলে বমি পায় যখন তখন আসা কেন। আর একাই বা আসা কেন? বলে সে সামান্য সরে দাঁড়াতেই পাশের সিট থেকে একটা গোঁফওয়ালা লোক

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, ও মশাই, কী করছেন! ছড়াচ্ছেন কেন! বসুন বসুন। বসে পড়ুন। নড়ে চড়ে সবাইকে আর মজাবেন না।

নিখিল বুঝতে পারছে, ওর শরীর থেকে টক ঝাল বমি বমি গন্ধটা এবার সারা বাসে ছেয়ে যাবে। সে বলল, আমি কি করব! এবং তার ইচ্ছে হল তখন সারা বাসে ছুটে বেড়ায়—যারা খুব নিরিবিলি মুখে বসে আছে সবার গায়ে গা লেপ্টে দেয়। বাসের ভাড়া যখন এক তখন সুখভোগও এক হওয়া দরকার।

আর একটা লোক তখন উঠে দাঁড়াল। খুব মাস্তানি কায়দায় বলল, যেখানে ছিলেন, থাকুন। বেব হয়ে দাঁড়াবেন কোথায়!

এবং নিখিল বুঝতে পারছিল, সে এখন সবার ভীতির কারণ হয়ে গেছে। সবাই লক্ষ্য রাখছে নিখিল যেন আর এক পা বের না হয়ে আসে। অস্পৃশ্যের মত সে। ছুঁলেই সবার বুঝি জাত যাবে। সবাই লক্ষ্য রাখছে সিট ছেড়ে সে কোথায় যায়। নিখিল বুঝতে পারল, যে দিকটায় সে এখন যাবে বাস ফাঁকা হয়ে যাবে। যেখানে গিয়ে সে দাঁড়াবে সবাই চিৎকার করবে, সরুন মশাই, গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। গন্ধে তারও ওক উঠে আসছিল। এমন সুন্দর মেয়েটার সব কিছু নিমেষে ভারি দুর্গন্ধময় হয়ে গেল। সে বুঝতে পারছে বাস কৃষ্ণনগর না যাওয়া পর্যন্ত সে কিছু করতে পারছে না। বাস কৃষ্ণনগরে গেলে প্রতিবারই সে সেখানে কিছু খেয়ে নেয়—তার খাওয়া দূরে থাকুক, এই উৎকট গন্ধ এখন গায়ে কতদিন লেগে থাকবে কে জানে।

অগত্যা নিখিল আর কী করে! সে তাব সিট থেকে যখন নড়তে পারছে না, তখন ফের মেয়েটির পাশেই বসে পড়া যাক এমন ভাবল। সে বলল, কী, আর বমি করবেন?

মেয়েটা বোকার মত ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

—আর বমি হবে মনে হচ্ছে?

মেয়েটা কী ভেবে চোখ নামিয়ে নিল।

—তাহলে উঠে বসুন।

মেয়েটা ওঠার চেষ্টা করল। পারল না।

—ঠিক আছে, শুয়ে থাকুন। কিন্তু সারা শরীরের যা অবস্থা—তারপরই ওর মনে হল শুয়ে থাকলে হাওয়া পাবে না। সে বলল, বসার চেষ্টা করুন। চোখে মুখে হাওয়া লাগলে আরাম পাবেন। সে মেয়েটিকে তুলে বসিয়ে দিল। কিন্তু বসে থাকতে পারছে না। মাথা ঘুরে যেন পড়ে যাবে। সে ফের বলল, ঠিক আছে, শুয়ে পড়ুন। তিনজনের লম্বা সিট—সে তার জামা খুলে সিট প্রথম পরিষ্কার করে মেয়েটিকে লম্বা করে শুইয়ে দিল। কাপড় এলোমেলো—সব সে টেনে ঠিক করে দিল। এমন কি স্তন থেকে শাড়ি সরে গেছে—সে তাও আঁচল দিয়ে ঢেকে দিল। আর এই প্রথম বুঝতে পারল মেয়েটির পাশের যুবক একজন যাত্রী মাত্র। মেয়েটা বমি করতেই যুবকটি অনেক দূরে সরে গেছে।

বাসি দাগের মত মেয়েটির মুখে হাতে পায়ে সব বমির দাগ। কত সহজে মানুষের স্নিগ্ধতা যে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নিখিলের কেমন একটা কষ্ট হচ্ছিল মেয়েটির জন্য। সে আস্তে আস্তে বলল—কোথায় যাবেন ?

মেয়েটির সাড়া নেই। অনেকেই উঠে এক এক করে দূর থেকে দেখে গেল। কাছে ভিড়ল না। দু-একজন মেয়ে যাত্রী—তারা আরও নিষ্ঠুর। তারা এ দিকটায় ভিড়লই না। নিখিল মনে মনে হাসল। মানুষের মধ্যে কি যে নিষ্ঠুরতা আছে—আবার এই মানুষই মাঝে মাঝে ভারি কর্তব্যপরায়ণ হয়ে পড়ে। যেমন সে কতবার কত ঘটনা এড়িয়ে গেছে জীবনে, কিন্তু এবারে আর কেন জানি এড়াতে পারল না। সে মনে মনে বলল, ধ্যাৎ।

নিখিল এবার কনডাক্টরকে বলল, কোথায় যাবে বলতে পারেন ?

কনডাক্টর সিট নাম্বার দেখে বলল, বহরমপুরে।

—কেউ যাচ্ছে না এর সঙ্গে ?

—কেউ তো কিছু বলছে না।

সে এবার কেমন বিরক্ত হয়ে বলল, বলুন তো, এ-ভাবে বাসে যাওয়া যায়। দেখুন নিচটা।

একজন এরই মধ্যে টিপ্পনি কাটল, কার মুখ দেখে বের হয়েছিলেন ?

ওর ইচ্ছে হয়েছিল বলতে, তোমার বাপের মুখ দেখে। কিন্তু কিছু বলল না। এ-সময় এক ঝামেলাতেই সে নাস্তানাবুদ, বাড়তি ঝামেলা বাড়িয়ে বিভ্রাট আর বাড়াতে ইচ্ছে হল না। অগত্যা জানালার ধারে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। সে যতটা পারছে মুখ বার করে রেখেছে। উৎকট গন্ধটা থেকে রেহাই পাবার এটাই একমাত্র পথ। পায়ের নিচে এবং তার পাশে জল বমি থিক থিক করছে। ওরও বমি উঠে আসছিল। একজনের সঙ্গে আর একজন। বেশ তাহলে জমবে। সে তার বমি প্রাণপণ দমন করার চেষ্টা করছে।

প্রথমে নিখিল বাঁ হাতের তালু শুঁকতে থাকল। ছেলেবেলা জ্বর হলেই ওর বমি পেত। কিছু খেতে পারত না। মা সামনে বার্লি রাখতেন। দু টুকরো কাগজি লেবু। লেবুর গন্ধ শুঁকেও যখন বমি ভাবটা যেত না মা তাকে বাঁ-হাতের তালু শুঁকতে বলতেন। এতে কতটা কাজ হয় সে জানে না তবে দেখেছে অন্যমনস্ক হলে বমি ভাবটা দূর হয়ে যায়। আসলে হাতের তালু শুঁকে অন্যমনস্ক করে দেওয়াই ছিল মা'র কাজ। সে এখন মায়ের সেই টোটকা ব্যবহার করে বেশ ভাল ফল পাচ্ছে।

তখন দুপাশে আবার রেল গাড়ির মত সার সার সব গাছপালা সরে যাচ্ছে। রাস্তা মেরামতের জন্য কেথাও দুটো একটা রোলার দাঁড়িয়ে আছে। জখমী রাস্তায় বাস চললে সুস্থ মানুষেরই ঠিক থাকার কথা নয়। বাস এমন ভাবে লাফায় যে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত উঠে আসার কথা। চোখে মুখে এখন নিখিলের ঝাপটা হাওয়া এসে লাগছে। বাইরে মুখ বের করে রাখায় অনেকটা স্বস্তি বোধ করল নিখিল। সে পায়ের নিচে অথবা পাশের মেয়েটির দিকে তাকাতেই পারছে না। তাকালেই কেমন গা গুলিয়ে উঠছে।

বাসটা শেষ পর্যন্ত একটা রেল গুমটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। দূরে ট্রেনের বাঁশি বাজছে। ট্রেন চলে গেলেই গুমটি খুলে দেবে। সে গুমটি দেখেই বুঝতে পারল কৃষ্ণনগরে এসে গেছে বাসটা। অ্যাটাচিতে তার জামা প্যাণ্ট আছে। কিন্তু জামা প্যাণ্ট পালটে সে এখানে আর

কিছুই বলছে না।

—সামনে টিউবওয়েল আছে। শাড়িটা ঠিক করে পরে নিন।

কিন্তু পারছে না। নিখিল নিজেই শাড়িটা জায়গা মত গুঁজে বলল, এবারে হাত ধরুন।

মেয়েটি কিছুই করছে না।

নিখিল এবার মেয়েটির ডান হাতটা কাঁধে ফেলে নিল। এবং এগিয়ে যেতে থাকল। তারপর শাসনের গলায় বলল, এত সখ কেন একা বের হবার! কেউ সঙ্গে নেই দেখছি। না কি আছে?

মেয়েটি এবার চোখ তুলে তাকাল। বিষাদ ছড়িয়ে আছে সারা চোখে। বড় চোখ বলে বিষণ্নতা চোখে থম থম করছে। আর কেন জানি মনে হচ্ছে চোখ দুটো খুবই লাল। খুব নেশা-টেশা করলে চোখের যে-রকম অবস্থা হয়, আর কি। আর আশ্চর্য, দাঁড়িয়ে থেকে আবার চোখ বুজে ফেলছে। চোখ খোলা রাখতে এত কষ্ট কেন! যেন সে দাঁড়িয়ে থেকেই আবার ঘুমিয়ে পড়বে।

আর তখনই মেয়েটি সহসা বসে পড়ল। সে আর পারল না।

—কি হল? বসে পড়লেন কেন?

—পারছি না।

যেন কত দূর থেকে মেয়েটি কথা বলছে। আর পারছি না! ভারি কষ্ট মেয়েটির। গভীর দুঃখ-টুঃখ আছে। সেটা কি?

নিখিল এবার বলল—আপনার সঙ্গে কিছু আছে? এই জামা-কাপড় টাপড়?

—আছে।

—কোথায়?

—নীল রঙের ব্যাগে। আর বলতে পারল না কিছু।

—বসুন। আসছি। নিখিল তড়াক করে বাসে উঠে গেল। এবং ফিরে এসে দেখল তামাসা দেখার মত কিছু লোক মেয়েটির চারপাশে ভিড় করেছে। সে বলল, কি দেখছেন? দেখার নেই কিছু। রাস্তায় বমি করেছে। বাস জার্নি অভ্যেস নেই। তারপর সে যেন কত নিজের

মানুষ, এবং মেয়েটিকে বলল, হাঁটতে পারবেন, না জল এখানে নিয়ে আসব ?

—আমি যাচ্ছি।

নিখিল তাড়াতাড়ি এক মগ জল এনে বলল, মুখ ধুয়ে ফেলুন। আসুন, জামা কাপড় পালটাবেন।

মেয়েটি নিজেই এবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। পাবল না।

নিখিল বলল, বলুন না, কি করতে হবে।

—মাথাটা ধোব।

—উঠুন। বলে সে দুহাতে মেয়েটিকে তুলে দাঁড় করাল। এবং একজন অতীব ক্ষীণকায় রুগ্ন মানুষের মত মেয়েটিকে সে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। মানুষের জন্য সে এ-ভাবে কিছু কখনও করেনি। দৈবাৎ ঘটনা ঘটে গেলে যা হয়—মান-সম্ভ্রমের কথা খুব একটা মনে থাকে না। অন্য সময় হলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু এখন নিখিলেব কাছে এটা একটা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের বোধ হয় এটা মাঝে মাঝে হয়। কে কি-ভাবে নিচ্ছে, অথবা এ-নিয়ে কেউ যদি মনে মনে মজা পায় তাতে নিখিলের কিছু আসে যায় না।

অথচ সেদিনের ঘটনা, সে বেশ রাত করে শিয়ালদা গিয়েছিল। শিযালদা থেকে সোজা মেসে যেতে হবে। স্টেশনে ঠিক এমনি একটি সুন্দরী বিবাহিত যুবতী অঝোরে চোখের জল ফেলছে। কেউ সঙ্গে নেই। পুলিস খবর নিচ্ছে—এবং কিছুটা রহস্যেরও গন্ধ ছিল। সে সেখানে এক মিনিটের জন্যও দাঁড়ায়নি। অযথা ঝুট-ঝামেলায় কে নাক গলাতে যায় ?

কলপাড়ে মেয়েটিকে বলল, জল দিচ্ছি। দাঁড়ান, দেখছি সাবান পাই কিনা কোথাও।

নিখিল সেই বেসিন থেকে আজ সত্যি এক টুকরো সাবান সবার অলক্ষ্যে তুলে নিল। এবং বাইরে এসে দেখল কলপাড়ে মেযেটি তেমনি বসে আছে। বাস ছেড়ে দিতে পারে, সবাই ওকে ফেলে চলে যেতে পারে, সে একা হয়ে যেতে পারে, কিংবা এই যে সাবান সংগ্রহের জন্য

চলে এসেছে সে আর নাও ফিরতে পারে—এ-সব নিয়ে মেয়েটির কোন যেন ভাবনা নেই। সে একা নয়, আর কেউ আছে তার সঙ্গে, তার হয়ে চিন্তা-ভাবনা বুঝি সেই করবে। নিখিল ভাবল, মানুষের যে কি হয়! আজ সকালে বাস-স্ট্যাণ্ডে আসার আগে জানতই না এমন একটি মেয়ে এই পৃথিবীতে আছে। সে কলপাড়ে দাঁড়িয়ে প্রথমে জল দিল মেয়েটিকে। মুখ ভাল করে ধুতে বলল। হাতে পায়ে বমি লেগে আছে সে নিজেই জল নিয়ে তা পরিষ্কার করে দিল। কারণ এখনও মেয়েটির শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই—সে যে-ভাবে যা করতে বলছে মেয়েটি তাই করে যাচ্ছে।

কিন্তু ঝামেলা শেষ পর্যন্ত শাড়ি সায়া খোলা নিয়ে, জামা-কাপড় পালটানো নিয়ে। সে বলল, বাথরুম আছে। আসুন। তারপর হাত ধরে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে বলল, বাইরে দাঁড়াচ্ছি। সব ছেড়ে ফেলুন। সে বাইরে বের হয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর বাইরে থেকেই হাঁকল, দাঁড়িয়ে থাকবেন না। তাড়াতাড়ি করুন। বাস কিন্তু ছেড়ে দেবে।

ভেতর থেকে কোন জবাব এল না।

সে দাঁড়িয়ে থেকে বুঝল, এত সময় লাগার কথা না। কি করছে! দরজা খুলে সে দেখতে পারে—কিন্তু যদি মেয়েটা তখন···সে আর ভাবতে পারছে না। অসুস্থ একটি মেয়েকে নিয়ে খারাপ কিছু ভাবাটাও এ-মুহূর্তে সে কেমন অন্যায় মনে করল। কি করে! সে আবার ডাকল, হল!

না, আর পারা যাচ্ছে না। দরজা সামান্য ঠেলে দিতেই মেয়েটি কেমন চকিত গলায় বলল, ও কি করছেন!

দরজা ভেজিয়ে দিল নিখিল। শরীর নিয়ে সতীপনা ঠিক আছে। এদিকে বাস ছেড়ে দিলে কেলেঙ্কারী হবে। নিখিল এবার শক্ত গলায় বলল, তাড়াতাড়ি করুন। বাস ছেড়ে দেবে।

মেয়েটি আবার তেমনি চুপচাপ। এক মিনিট, দু মিনিট, কাঁটা ঘুরছে, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট—আপনি কি আমাকে শেষে বিপদে

ফেলবেন ! বাস ছেড়ে দিলে আবার সেই বিকেলের বাস। কি হবে বুঝতে পারছেন ? আপনি কি ··মেয়েটি তখনই কাতর গালায় কি বলল। সে বাইরে থেকে বুঝতে পারছে না। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে সে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। কিছুই করে নি। অসাড় শরীর নিয়ে প্রায় অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় বসে রয়েছে। মেঝেতে হাত ভব করা। যেন এক্ষুনি শুয়ে পড়বে। নিখিলের মাথা কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। এমন একটা বিতিকিচ্ছিরি পরিস্থিতি সে জীবনেও ফেস করে নি। সে দরজা বন্ধ করে একেবারে দাঁড় করিয়ে সব শরীর থেকে খুলে দিল মেয়েটির। এক হাতে জড়িয়ে রেখেছে শরীর। ঠিক শিশুর মত ওকে সায়া পরিয়ে ব্লাউজ গায়ে দিয়ে বলল, শাড়িটা পেঁচিয়ে নিন। এবং মেয়েদের শরীরে যে সুবর্ণ বাতিঘর থাকে সে প্রথমে আজ স্পষ্ট দেখতে পেল। আবছা অন্ধকারেও যুবতীর চোখ বোজা !

—আপনার কি হয়েছে ?

মেয়েটি বিড় বিড় করে কিছু বলার চেষ্টা করল। পারল না।

সে বলল, জোরে বলুন। কিছু বুঝতে পারছি না।

মেয়েটি তখন যা বলল, তার অর্থ সে এখন শুয়ে ঘুমোবে। আর কিছু চায় না।

—চলুন। বলে সে প্রায় মেয়েটিকে পাঁজা করে কোলে তুলে বাইরে এসে দাঁড় করাল। বলল, এবাবে একটু হাঁটুন। ভয় নেই, পড়বেন না। ধরে আছি।

তাবপর নিখিল বাসে উঠে দেখল সব ধুয়ে দেওয়া হয়েছে।

তোয়ালের ভেতর ভেজা জামা-প্যাণ্ট। বাড়ি পৌঁছে সব ভাল করে সাবানে কাচতে হবে। মেয়েটাব শাড়ি সায়া ব্লাউজ সবই এক সঙ্গে বয়েছে।

সে তার সিটে মেয়েটিকে শুয়ে পড়তে বলল।

মেয়েটি ওকে এবার বেশ অবাক করে দিল। বলল, শোব না।

—বসে থাকতে কষ্ট হবে।

—হবে না।

—তবে জানালার ধারে বসুন।

মেয়েটি বসে পড়েই সিটে মাথা এলিয়ে দিল। তারপর খুব ক্ষীণ গলায় বলল, আমি মরে গেলে বাড়িতে খবরটা পৌঁছে দেবেন।

নিখিল বলল, তার মানে?

মেয়েটি আর জবাব দিল না।

—আপনি কি বলছেন? মরা বুঝি এত সহজ!

—ব্যাগে আমার ঠিকানা আছে।

নিখিল বলল, সে দেখা যাবে।

বাসের যাত্রীরা একে একে উঠে আসছে। সেই যুবকটি এসে নিখিলের পাশে বসল। বলল, কোথায় যাবেন?

নিখিল বলল, বহরমপুর।

—কি বমি!

এখন ও-কথা থাক। বমির কথা মনে হলে যদি মেয়েটি ফের বমি করতে আরম্ভ করে দেয় ভেবে সে অন্য কথা পাড়ল। সকালে বেশ ঠাণ্ডা ছিল—আর এখন কী গরম।

যুবকটি বলল, ওর সঙ্গে বুঝি আপনি যাচ্ছেন?

নিখিল বলতে পারত, মশাই তাহলে এতক্ষণ কি শুনলেন। কিন্তু এ সব নিয়ে কথা বাড়ালে মেয়েটির হয়ত অস্বস্তি বাড়বে। সে বলতে পারত, না মশাই আমার কেউ না। সাত জন্মেও পরিচয় নেই। তারপরই মনে হল এটা বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। কোন যুবকেব কাছেই যুবতীরা দূরের হয় না। সে বলল, হ্যাঁ।

যুবকটি বলল, বাসে এই একটা ঝামেলা।

নিখিল জানতে চাইল না—কী ঝামেলা। কারণ সে বুঝতেই পারছে ঝামেলা মানে বমি-টমি পায় বাসে গেলে। দূর পাল্লার বাসে এটা আবার হামেশাই হয়। কিন্তু মেয়েটির সেই ট্যাবলেট খাওযা এবং আমি মরে গেলে খবর দেবেন কথাটা ওকে কেমন সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিল। তখনই পাশের সিট থেকে একজন বলল, কেমন আছে?

—ভাল আছে।

বাস আবার বাতাসে ভেসে যাবার মতো ছুটে চলেছে।

একবার ইচ্ছে হল নিখিলের জিজ্ঞেস করে মেয়েটিকে, বহরমপুরে কোথায়, কার বাড়ি যাবেন? সে তো শহরের অনেককেই চেনে। মা বাবা ভাই বোনেরা কাছাকাছি একটা গ্রাম মত জায়গায় সেই কবে থেকে আছে। বোনেরা শহরের কলেজে পড়তে আসে। অর্থাৎ বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে একটা রিক্সা নিলে আধ ঘণ্টার মত সময়—শহরের ভেতরে যাবার আগে তার বাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায়।

আবার একটা নদী। মেয়েটি চোখ বুজে পড়ে আছে। আর মাঝে মাঝে কি যেন বিড় বিড় করে বকছে। সে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। বাসের ঘড় ঘড় শব্দে সবই এত অস্পষ্ট যে সে কিছুতেই কোন কথা উদ্ধার করতে পারল না। হাওয়ায় চুল উড়ছে এবং চুলে এলোমেলো হয়ে আছে মুখটা। নিখিলের ভারি ইচ্ছে হচ্ছে চুলগুলি মুখ থেকে সরিয়ে দেয়। শরীরে মেয়েটির আবার সেই মনোরম গন্ধ। যেন ধীরে ধীরে যুবতী আগের মতো আবার ফুটে উঠেছে। এবং তখনই মনে হল মেয়েদের যে কি থাকে। এখন সে ইচ্ছে করলে আদর করতে পারে, চুমু খেতে পারে। এবং সে যেহেতু সবই দেখে ফেলেছে মেয়েটির—তার কেমন যেন হক জন্মে গেছে সব কিছুর ওপর। এবং ওর পুষ্ট স্তন, নাভিমূলের রেখা ইত্যাদি সবই এখন চোখের ওপর ভাসছে। এতে নিখিলের শরীর আবার উষ্ণ হয়ে উঠেছিল। মেয়েটি জানেও না, নিখিল এখন এই শরীর বাদে আর কিছুই ভাবছে না। ফলে কেন জানি বেশ ভাল লাগছে এই মাঠ, ঘাট, আকাশ, হেমন্তের সোনালী ধান। সে বলল, ঘুমোচ্ছেন?

মেয়েটি জড়ান গলায় বলল—না।

নিখিল বুঝতে পারছিল, মেয়েটির কথা বলতেও কষ্ট।

—আর বমি পাচ্ছে না তো?

—না।

—যা রাস্তা!

মেয়েটি কিছু বলল না।

—কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে! পেটে তো কিছু নেই।

—না।

—কোথায় যাবেন?

—জানি না।

আর কি কথা বলা যায় মেয়েটির সঙ্গে নিখিল ভাবতে থাকল।—চুলগুলি সরিয়ে দিন।

মেয়েটি মুখ থেকে চুল সরিয়ে দিল। কিন্তু হাওয়ার দাপটে আবার যেমনকে তেমন। খোঁপা খুলে গেছে বলে সারা মাথায় চুল এলোমেলো হয়ে আছে। কেমন উদাস উদাস লাগছে যুবতীকে।

নিখিল বলল, বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে না তো!

মেয়েটি কিছু বলল না।

—শোবেন?

মেয়েটি ওর দিকে তাকাল। আর আশ্চর্য নিখিল দেখল, চোখ থেকে মেয়েটির দু ফোটা জল গড়িয়ে পড়ছে।

নিখিল এমন দৃশ্যে খানিকটা বিব্রত বোধ করল। মেয়েটির কি মনে পড়ছে সব—মনে করতে পারছে সে তার সব কিছু দেখে ফেলেছে। এতে কি মেয়েটির মধ্যে কোন ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে? অথবা অসহায় বলে একজন অপরিচিত যুবকের কাছে এতদিনের গোপন ঐশ্বর্য ধরা পড়ায় ভেতরে কোন গ্লানি! নিখিল ভাবল সে এতটা গায়ে পড়া ভাব না দেখালেই পারত। তারপর আরও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিখিলের মনে হল, এ-জন্যে কেউ চোখের জল ফেলে না। আর এটা মনে হতেই সে সাহস পেয়ে গেল। বলল, আপনি যদি কিছু মনে না করেন।

কোন সাড়া নেই।

—ট্যাবলেটগুলো খাচ্ছিলেন কেন?

সেই একই ভাবে পড়ে আছে যুবতী।

তারপর কেন জানি নিখিলের মনে হল সে বড়ই আহাম্মকের মত প্রশ্ন করছে। সে যেমন এতক্ষণ রাশভারি ছিল এখনও তেমনি রাশভারি হতে গিয়ে আর কোন কথাই খুঁজে পেল না।

গাড়িটা ভয়ঙ্কর লাফাতে লাফাতে আবার ছুটছে। সে ঘড়ি দেখল। মনে হল গাড়ি একটার আগেই বহরমপুরে পৌঁছে যাবে। ওরা বেলডাঙ্গা এসে গেছে। এখান থেকে মিনিট চল্লিশের পথ গেলেই বহরমপুর। গাড়ি সময় মতই যাচ্ছে। সকালে কার মুখ দেখে সত্যি বের হয়েছিল, এখন আর তা মনে করতে পারল না। একটা আকস্মিক খণ্ডযুদ্ধের পর নিরিবিলি শান্তি। তারও মেয়েটির পাশে কিছুক্ষণ চোখ বুজে চুপচাপ পড়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। সে সিটে মাথা এলিয়ে দিল।

চোখের ওপর দিয়ে সারি সারি গাছপালা মাঠ তেমনি সরে যাচ্ছে। চোখ সত্যি বুজে আসছিল। কিন্তু এ দিককার সব গ্রাম মাঠ তার চেনা। ভাবদার গুমটি পার হয়ে বাসটা সারগাছির দিকে যাচ্ছে। এদিকটায় এক সময় এত ঘরবাড়ি ছিল না। এখন অনেক নতুন ঘরবাড়ি হয়েছে, পাটের আড়ত হয়েছে। দোকান-পসার বসেছে বড় বটগাছটার নিচে। তার চোখ বুজে আসছিল, কিন্তু আর পনের বিশ কি বেশি হলে পঁচিশ মিনিটের মধ্যে গাড়িটা বহরমপুর পৌঁছে যাবে। এই তো সারগাছি পার হয়ে গেল। আশ্রমের গেট পার হয়ে গেল। এবং আর একটা লম্বা টান, তারপরেই দেখা যাবে একটা বড় পেট্রল পাম্প—এবং তারপবে বাসটা ঘুরলে, তার চেনা পথ, সেই সামনের রহস্যময় পথটা পার হয়ে যাবে। এবং গাড়ি থেমে গেলে একটা রিক্সায় চড়ে সেই রহস্যময় পথটা ধরে বাড়ি ফেরা।

বহরমপুর গুমটির কাছে বাসটাকে আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। দূরে সে দেখতে পেল একটা মালগাড়ি আসছে। সিগনাল ডাউন। অনেক দূর থেকে ট্রেনটা লম্বা একটা মরীচিকার মত এঁকে-বেঁকে ধেয়ে আসছে।

সে এবার উঠে দাঁড়াল। গুমটি পার হবার তার দরকার নেই। রিক্সা পেলে সে এখান থেকেই বাড়ির পথ ধরতে পারে। এবং কাছে হয় এখান থেকে। উঠে নিচে চারধারে উঁকি দিয়ে দেখল কোন রিক্সা নেই। সব রিক্সা গুমটি পার হয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে ভিড় করেছে। স্ট্যাণ্ডে না গেলে সে বুঝতে পারল, রিক্সা পাবে না।

গাড়িটা আর এক টানে একটা হোটেলের পাশে ভিড়তেই সবাই হুড়মুড় করে নামতে থাকল। কেবল মেয়েটির কোন তাড়া নেই। সে বেহায়ার মত বলল, বহরমপুর এসে গেছে। নামুন। এখানে আপনার শাড়ি সায়া রয়েছে।

মেয়েটির কোন সাড়া নেই।

তার অনেক কাজ। বাড়িতে গিয়ে স্নান, দুপুরের খাওয়া, ফিরতি রিক্সাতে জেলাবোর্ডের অফিসে কিছু কাজ, খুবই তাড়া আছে—অথচ মেয়েটি হাত পেতে তার ভিজা সায়া শাড়িটা কিছুতেই নিচ্ছে না। সে এবার বেশ জোরে বলল, বহরমপুর এসে গেছে, নামুন।

মেয়েটি তখন শুধু বলল, ভারি তেষ্টা।

জল সে নিচে নেমে এনে দিতে পারত। বাসটার এখানে আধ ঘণ্টার মতো হল্ট। মেয়েটা তবে কি আরো দূরের যাত্রী? নিখিল বলল, নামুন। দেখি কোথায় জল পাওয়া যায়। কোথায় যাবেন?

মেয়েটি এবার তার হাত বাড়িয়ে দিল। বোঝাই যায় বমি করে বড় অবসন্ন মেয়েটি। একা যাবেই বা কি করে! ভারি বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেছে সে, এটা বুঝতে পারছে। কিছু না বলে নেমে গেলেই হত। তবু কি যে হয় মানুষের, ঝুঝি রহস্যময় পথ একটা মানুষের জন্য থেকেই যায়—সে ইচ্ছা করলেও বুঝি শেষ পর্যন্ত কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারত না। সে মেয়েটিকে ধরে ধরে নামাল। প্রায় নিজের কেউ যেন। পাশ থেকে একজন অসভ্য মতো যুবক বলল, খুব মজাকি হচ্ছে।

মজাকি শব্দটার কি অর্থ নিখিল জানে। সে এমন আরও শুনেছে। সে বলতে পারত, কি মজাকি দেখলে হে। অথচ এখন কোন কারণেই ঝগড়া করার সময় তার হাতে নেই। মেযেটি তার কেউ নয়, সে কোন মজাকি করেনি বলতে পারত এবং দাঁড়িয়ে যুবা বয়সে যে ভাবে হিরোগোছের মানুষের মত কথাবার্তা বলার কথা, তার ভেতর সে সবেরও কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না। বরং আমল না দিয়ে এখানে কোথায় সামান্য খাবার জল পাওয়া যায় তার চেষ্টায় মেয়েটিকে ধরে ধরে

একটি চায়ের দোকানের সামনে নিয়ে গেল। বলল, বসুন। এক গ্লাস জল হবে? জল দিয়ে বলল, চা খাবেন? খাবার?

মেয়েটি মাথা নাড়ল। নিখিলের বুঝতে অসুবিধা হল না, যত কথা বলবে, তত মানুষের কাছে রহস্য বাড়বে, এবং একটা ভিড়ও জমে যেতে পারে। মানুষের নাটক দেখার স্বভাব জন্মগত। দোকানি বলল অসুস্থ বুঝি!

সে বলল, হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি রিক্সা ডেকে বলল, উঠুন।

নাবালিকার মতো মেয়েটি ওর দিকে তাকাচ্ছে। সে ফের বলল, উঠুন।

—কোথায়?

—যেখানে যাবেন।

—আমি তো কোথাও যাব বলে বের হয়েছি। কিন্তু সেটা কোথায় জানি না।

নিখিল ভারি বিব্রত বোধ করল। যে কেউ তাকে বলতে পারে আপনি বুঝি মেয়ে নিয়ে পালাচ্ছেন। সুন্দরী যুবতী সঙ্গে থাকলে এমনিতেই মানুষের কৌতূহলের অন্ত থাকে না। আর মেয়েটি যে কী সব বলছে!

সে নিজেও কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেছে। তবু সে কেন জানি বুঝল, এই মেয়ের কোথাও কিছু হারিয়েছে। যা হারালে মানুষ সহজেই মরে যেতে চায়। এবং সেই ট্যাবলেটগুলোর কথা মনে হতেই সে সাহস পেয়ে গেল। বলল, উঠুন তো!

রিক্সাতে উঠে মেয়েটিকে একা পেয়ে গেল নিখিল। এখন ইচ্ছেমত সে সব জেনে নিতে পারবে। কোথায় সত্যি যাবে অথবা যেতে চায়। সে এবার বেশ রুক্ষ গলায় বলল, কোথায় যাবেন বলুন? কোন্ পাড়ায়? কার বাড়িতে?

—কোথাও না। আমি কোথাও যাব না।

নিখিল ভীষণ জোরে ধমক দিল, নাটক করবেন না। ঠিক বলুন বাড়ি থেকে কি ভেবে বের হয়েছেন। কোথায় যাবেন ভেবে বের হয়েছেন।

এবারে যে মেয়েটির কী হল, হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

নিখিল ভারি বিরক্ত বোধ করছে। কি যেন এক অশুভ রহস্যের মধ্যে সে জড়িয়ে গেল। সে এবারে খুব নরম গলায় বলল, কোথায় যাবেন বলুন, দিয়ে আসছি।

রিক্সাটা যাচ্ছিল। মেয়েটা সোজা বসে থাকতে পারছে না। মাঝে মাঝে নিখিলের ঘাড়ে মাথা ঢুলিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে মান-সম্ভ্রমের কথা মনে হলে মাথা তুলে সোজা বসে থাকার চেষ্টা করছে।

রিক্সাটা এখন শহরের দিকে যাচ্ছে। দু পাশে কিছু দোকান পাট, হাসপাতাল, মেয়েদের কলেজ, কোথায় তারা যাবে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয় নি রিক্সাওয়ালাকে, তবু যেন শহরের অভ্যন্তরে ওরা প্রবেশ করার জন্য চলে যাচ্ছে। নিখিল বুঝতে পারছে না কি করবে!

সে বলল, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন বুঝি?

মেয়েটি ওর দিকে কেমন এবার বড় বড় চোখে তাকাল। তারপর অনেক গভীর থেকে বলার মত স্পষ্ট করে বলল, হ্যাঁ, সবার কাছ থেকে পালাতে চেয়েছিলাম। শেষে কেমন উত্তেজিত গলায় প্রায় সত্যি নাটকের মত সহসা চিৎকার করে উঠল, কেন আপনি আমাকে বাঁচালেন? কেন, কেন, কি ক্ষতি করেছি আপনার? বলতে বলতে অঝোরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

এবারে নিখিলের কাছে ধীরে ধীরে যেন সব গোলমেলে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সে রিক্সায়ালাকে বলল, ওদিকে না। তারপর বলল, বেশ নাটক করবেন ভেবে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। ট্যাবলেটগুলো কিসের? ভাগ্যিস, রাস্তাটা জখমী ছিল। বমি টমি হয়ে যাওয়ায় বেঁচে গেলেন।

কিছু বলল না মেয়েটি। মুখে রুমাল চেপে বসে আছে।

সে এবার বলল, কি নাম? সব না বললে তো পুলিসের হেফাজতে রেখে আসতে হবে।

ভারি করুণ চোখে তাকিয়ে বলল, আপনাকে আমি কোন বিপদে ফেলব না।

—নাম কি বলবেন তো!

মেয়েটি অত্যন্ত লাজুক গলায় নাম বলল।

—এমন সুন্দর যার নাম সে কখনও আত্মহত্যা করতে পারে!

তারপরই নিখিল বলল, কিন্তু এখন আপনাকে নিয়ে যাব কোথায়? সোনালী তেমনি মাথা নিচু করে বসে থাকল।

একটু থেমে বলল, কী, কথা বলছেন না কেন?

সোনালী বলল, মরে যাব বলে বের হয়েছিলাম, এবারে তা আর হল না।

নিখিল বলল, খুব ছেলেমানুষ আপনি, এমন সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে আপনার?

একটু থেমে বলল, কী, কথা বলছেন না কেন?

অন্যদিকে তাকিয়ে সোনালী বলল, না, করে না।

দু-পাশে তখন গাছগাছালি, হেমন্তের দুপুর—সেরিকালচার ফার্মে সব সবুজ সারি সারি তুঁতগাছ। কত সব সুন্দর রেশমের পোকা পাতার মধ্যে বাড়িঘর বানাচ্ছে। মেয়েটি সব দেখছিল এবার ভাল করে। নেশার মত ভাবটা কেটে যাচ্ছে। বড় বড় চোখে আবার এই সব গাছপালা রোদ্দুরের ভেতর পাশের যুবকটিকে তার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কতকাল পর যেন এক দূর অতীতে কোন যুবকের মুখে আশ্চর্য ভালবাসার ঘ্রাণে সে সতেজ হয়ে উঠল। সে তাকিয়ে থাকল নিখিলের দিকে। তার এখন আর কিছুতেই চোখ নামাতে ইচ্ছে করছে না।

পৃথিবীতে মানুষের কখন কেমন দিনক্ষণ যায় কেউ বলতে পারে না। এই মেয়েটিও জানত না, নিখিল নামক এক যুবক এই গ্রহে আছে। সে জানত, এই গ্রহে একজনই যুবক আছে, তার নাম নিরুপম। নিরুপম এখন অনেক দূরে। নিরুপম কি ট্রেনে চড়ে কোথাও চলে যাচ্ছে।

তখনই নিখিল রিক্সাওয়ালাকে বলল, নিমতলায় যাব।

রিক্সাওয়ালা মোড়ের মাথা থেকে রিক্সা ঘুরিয়ে দিল।

নিখিল বলল, মরে গেলে কী হত বলুন তো!

সোনালী বলল, জানি না।

তারপর নিখিল বলল, কি এত দুঃখ প্রাণে যে, মরে যাওয়া বাদে কোন অবলম্বন ছিল না হাতে।

সোনালী মাথা নিচু করে বসে থাকল।

নিখিল বলল, এখন আর কোন ফিরতি বাস অথবা ট্রেন নেই। তোমাকে তুলেও দেওয়া যাবে না। আমার সঙ্গেই যেতে হবে।

সোনালী মনে মনে বলল, আমি কিছু জানি না নিখিলবাবু। যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাব।

রিক্সাটা যাচ্ছে। নিখিল আস্তে কথা বলছিল। রিক্সাওয়ালা আবার শুনতে যেন না পায়। সে বলল, সোনালী, তোমাকে তুমি বলছি। কলকাতায় কোথায় থাক।

সোনালী বলল, সল্ট-লেকে।

—কে কে আছে?

—সবাই আছেন।

—মা বাবা?

—আছেন।

—ওঁরা কী ভাবছেন বল তো। এখন একটা ট্রাংকল করা দরকার। বাড়িতে ফোন আছে?

—আছে।

—কি নম্বর?

সোনালী বলল, ওরা জানে আমি মাসির বাড়িতে গেছি।

—সেটা কোথায়?

—রাণাঘাট।

—রাণাঘাটে যাবে বলে বের হয়েছ? কিন্তু কনডাক্টর যে বলল, বহরমপুর।

—টিকিট বহরমপুরেরই কেটেছিলাম।

—ক'টা খেয়েছিলে?

সোনালী আবার চুপ।

—যোগাড় করলে কী করে?

সোনালী আবার চুপ।

—আমার সঙ্গে আজ থাকতে হবে।

—থাকব।

—বাড়িতে কি পরিচয় দেব ?

—দেবেন যা খুশী।

—আচ্ছা সোনালী, যদি বমি না হয়ে যেত ?

—মরে যেতাম।

—কার জন্য ?

—জানি না।

নিখিল ঠাট্টা করে বলল, আমার খুব হিংসে হচ্ছে।

—কাকে ?

—তোমার মানুষটাকে।

—আমার মানুষ !

—যার জন্যে মরে যেতে চেয়েছিলে !

সোনালীর ঠোঁটে আশ্চর্য বকমের প্রতিহিংসা ফুটে উঠল। এখন আর সোনালীকে তরুণী ভাবা যায় না। খুবই অভিজ্ঞ এবং পোড়খাওয়া মনে হচ্ছিল সোনালীকে। সে তেমনি আবার মাথা নিচু করে রাখল।

নিখিল বুঝল, মানুষটার কথায় সোনালী কষ্ট পায়। সে এবার অন্য কথায় এল। বলল, চারপাশে দেখছ কি গাছ।

সোনালীকে নিখিল এ-ভাবে অন্যমনস্ক করতে চাইল। রাস্তাটা খুবই নিরিবিলি। পাকা সড়ক এবং দু-পাশে গভীর বনের মত—লতাপাতায় গাছগাছালি সবই ঢেকে আছে। আর নিখিলের যে কি হয়, এই পথটাই সেই আবাল্যের রহস্যময় পথ। এখানে এসেই সে তার শৈশবকে খুঁজে পায়। সে বলল, জান সোনালী, এই রাস্তাটা আমার খুব প্রিয়।

সোনালী বলল, তাই বুঝি।

—এই রাস্তাটায় এলেই আমি কেমন অন্য মানুষ হয়ে যাই।

সোনালী হঠাৎই বলল, আপনাব বুঝি কোন দুঃখ নেই ?

—না। কোন দুঃখ নেই।

—আপনার মরে যেতে ইচ্ছে হয়নি কখনও ?

—না।

সোনালী ফের বলল, মরে যাওয়াটা কি খুব অন্যায় ?

—বা রে, অন্যায় নয়। বেঁচে থাকার মত পৃথিবীতে বড় কিছু নেই, জান ?

—যদি মনে হয় বেঁচে থেকে কী আর হবে ?

—মানুষের এটা ক্ষণিকের ইচ্ছে।

—ইচ্ছেটা যদি খুব প্রবল হয় ?

—তখন অবশ্য কি করা দরকার আমি জানি না সোনালী।

তারপর দুজনেই চুপচাপ। দুটো ট্রাক গাড়ি পর পর চলে গেল। অনেক দূর থেকে আসছে একটা গরুর গাড়ির আওয়াজ। ওরা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। পাশে ছোট্ট একটা মন্দির পড়ল—এবং কিছু দোকান পাট আবার, তারপর কিছু শস্যক্ষেত্র পার হলে একটা এল. সি. কলেজ এবং অরফ্যান-হাউস। তারপর কিছুটা গেলেই ছিমছাম আশ্রমের মত সেই বাড়িটা।

নিখিল বলল, আমার এখানে দু-একদিন থাকার কথা। বিকেলের ট্রেনে তুলে দিলে যেতে পারবে না ? আর একা ছেড়েই বা দি কি করে! কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে আবার উঠবে কে জানে!

সোনালী বলল, আপনার কি মনে হয়, আবার আমি আত্মহত্যা করতে পারি ?

নিখিল বলল, আস্তে।

সোনালী তেমনি চেয়ে আছে নিখিলের দিকে!

—কি করে বলব। তবে বিশ্বাস নেই।

সোনালী হাসল। এই প্রথম হাসল। বলল, বোকারা আত্মহত্যা করে। এটা আপনার সঙ্গে যেতে যেতে বুঝে ফেলেছি। একটা না একটা মানুষের রহস্যময় পথ থেকেই যায়—যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে আগে এটা জানলে কে এমন ছেলেমানুষি করে ?

নিখিল ভাবল, যাক, কথা ফুটেছে। এবং মনে হল মেয়েটি সত্যি

ভারি চঞ্চলা। অথচ বাসে এবং গোটা রাস্তায় মনে হয়েছে ভীরু এবং কাচের মত ক্ষণভঙ্গুর মেয়ে। হয়তো তাই ছিল। কিংবা অভিজ্ঞতা কখনও মানুষকে খুব অল্প সময়ে খুব বেশী বড় করে দেয়।

নিখিল বলল, এসে গেছি। কিন্তু বাড়িতে কি বলব ?

—কেন, আপনার কোন--

—এখনও তো তেমন কিছু হয়নি সোনালী।

সোনালীর মুখটা আশ্চর্য এক সুখে ভরে গেল। বলল, আপনার যা খুশি বলবেন।

নিখিল আর কথা বলল না। অর্জুন গাছটার নিচে রিক্সা থামতেই বাড়ি থেকে প্রায় হল্লা—মা, সেজদা এসেছে। সঙ্গে কে একজন এসেছে মা।

একটা অর্জুন গাছ আর পাকা সড়কের মাথায় রিক্সাটা দাঁড়িয়ে গেল। নিখিল নেমে এল। হাতে অ্যাটাচি। সোনালীর ব্যাগটা সে নিজের হাতেই রাখল। পাশে ভিজা সায়া শাড়ি। গীতা সুমিতা ছুটে এসে সোনালীর দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

নিখিল শুধু বলল, সোনালী।

ওরা বলল, আসুন।

সোনালী নেমে গেল।

একতলা বাড়ি। সামনে ছোট্ট লন। কিছু ফুলের গাছ। এই জবা ঝুমকো স্থলপদ্ম টগর যুঁই ফুলের গাছ। হেমন্তের সময় বলে এখনও স্থলপদ্ম গাছটার কিছু ফুল ফুটে আছে। নুড়ি বিছানো পথ, উঠোন পার হতেই বাবার গলা পেল নিখিল। বলল, ভাল আছ ?

নিখিল বলল, ভাল আছি। আমার বাবা।

সোনালী হাঁটু গেড়ে প্রণাম করল।

মা বের হয়েই বলল, ওমা, এ যে প্রতিমার মত দেখতে! কে রে!

নিখিল বলল, সুবন্ধুর বোন।

সুবন্ধু এ-বাড়ির সবাইকার পরিচিত। একবার হাজারদুয়ারী ও দেখতে এসেছিল নিখিলের সঙ্গে। ক'দিন ছিল। ইংরেজী পড়ায় একটা কলেজে।

নিখিলের মা শৈল বলল, এস মা।

গীতা বলল, তোমাকে তবে সোনালীদি ডাকব।

সুমিতা বলল, আমি দিদি ডাকব না। তুমি আমার ছোট হবে। তুমি আমাকে দিদি ডাকবে। এত সবের পরে সংসারে কোন না কোন 'কিন্তু' থেকে যায়। বারান্দায় পায়চারি করতে করতে সুরেশ বললেন, ক'টার বাসে এলি ?

—একটার বাসে।

বাবার নানা রকমের প্রশ্ন করার বাতিক। সোনালী ঠিকমত জবাব দিতে পারবে কিনা কে জানে। সুবন্ধুরা থাকে ঢাকুরিয়ার দিকে। সুবন্ধুর সঙ্গে বাবার প্রায় বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল। কত রকমের কথা হত এবং সুবন্ধুকে নিয়ে বাবা সকালে বাজারে যেত। এত সব প্রশ্ন করেছিল সুবন্ধুকে যে প্রায় কোন ডিটেকটিভ উপন্যাসের হিরো হয়ে গেছিল সুবন্ধু।

মানুষ বুড়ো হলে যা হয়। —তোমার বাবা কি করেন ? কোথায় থাক। ক' ভাই বোন। ভাইয়েরা কে কি করে ; বোনেরা। বাজার বাড়ি থেকে কতদূর। সকালে বেড়াও তো। প্রাতর্ভ্রমণ শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী। কলকাতা শহরে বড়ই অসুবিধা। মানুষ মাটিতে হাঁটতে পারে না। এ-জন্য এত রোগ কলকাতায়। মানুষও মরে তেমনি। সকালে খালি পায়ে রোজ হাঁটবে। এতে হার্টের অসুখ হয় না। বাবার নিজস্ব ধারণাগুলি নিয়েই কথাবার্তা বলা বাবার স্বভাব এবং তাঁর যা কিছু বিশ্বাস সবই মানুষের উপকারে লাগে ভেবে নিখিল দেখেছে, যেই বাড়িতে আসুক তাকে এই সব উপদেশাবলী একবার করে শোনাবেই। এবং ফাঁকে ফাঁকে এমন সব কথা জিজ্ঞেস করবে যে, নাড়ী নক্ষত্র সব তখন বের হয়ে আসবে।

ফলে বাবাকে নিয়ে নিখিলের একটা ভয় আছে। এই মেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে বের হয়েছিল—কোন ব্যর্থ প্রেম-ট্রেমের জন্য যুবা বয়সে মানুষ যে সব হঠকারী কাজ করে থাকে আর কি। সে এখনও জানে না, কে[illegible] সোনালী নিজেকে বিনাশ করতে চেয়েছিল। সোনালী না বললে [illegible]

জানতে পারবে না। এবং এ সম্পর্কে সোনালীকে কোন প্রশ্নও করা যায় না। ভদ্রতায় বাধে। এখন বাবার পাল্লায় পড়ে কি না জানি হয়। বাবা এমন সব কথাবার্তা শুরু করে দেবেন যে সোনালী বিগলিত হয়ে না আবার সব সত্যি কথা বলে ফেলে।

বাড়িতে নিখিলের নিজস্ব একটি ঘর আছে। সেটা দক্ষিণের দিকে। সে তার নিজের ঘরে ঢুকে প্রথম একটু বসল। সোনালী এখন বোনেদের সঙ্গে। সে ওদের ঘরেই থাকবে। এবং মনে হয় সোনালী মুহূর্তে এ-বাড়ির মেয়ে হয়ে গেছে। এ-বাড়িতে কিছু আশ্চর্য রকমের সারল্য আছে সবার। ফলে যত দূরেরই হোক মানুষকে আপন করে নিতে কারও বেশী সময় লাগে না।

মা'র গলা পাওয়া যাচ্ছে, ও গীতা, সোনালীকে চান করে নিতে বল। বেলাও কম হয়নি। নিখিলকে বল পুকুর থেকে চান করে আসতে। দু কৌটা ভাত বসিয়ে দে।

নিখিল জামা-প্যাণ্ট খুলে ডোরাকাটা পাজামা পরল। জানালা খুলে দেখল শিউলি গাছটার নিচে কিছু বাসি ফুল শুকিয়ে আছে। বাবার স্বভাব সাবেক আমলের মানুষের মতো চলাফেরা করা। তাঁর খড়মের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বোধ হয় ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন। বের হতে হতে মিনিট। তারপর খাবেন। রাতে খৈ দুধ খান। নিখিল বাবার কোন কঠিন অসুখ-বিসুখ দেখেনি। সর্দি-কাশি কিংবা সামান্য আমাশয় হলে বাবা নিজের হাতেই ওষুধ তৈরি করে নেন। সন্তানদের অসুখের বেলায়ও দেখেছে সহজে ডাক্তার ডাকার পক্ষপাতী তিনি নন। অন্ততঃ তিন-চারদিন তিনি গাছগাছালি থেকে নিজের তৈরী ওষুধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন। এবং প্রায় সময়ই দেখেছে নিখিল এতে অধিকাংশ সময়ই ওরা নিরাময় হয়। নিরাময় হতে বেশী সময় লাগে না। বাবার মতে ডাক্তার না তো যম। যমের হাত থেকে যত দূরে রাখা যায়।

ফলে আর দশটা বাড়ির চেয়ে এ-বাড়ির পরিবেশ ভিন্ন রকমের। বাবা ঠাকুর ঘরে যেতে যেতে বললেন, সোনালী কোথায়?

—আমি এখানে মেসোমশাই।

—চান করে ঠাকুরঘরে আসবে।

নিখিলও তার ঘর থেকে শুনতে পেল কথাটা। এই রে, খেয়েছে! সোনালীর পুরো নাম সে এখনও জানেই না। সোনালীও জানে না সুবন্ধু কে। সুবন্ধুরা চক্রবর্তী। সোনালী যদি বামুন না হয়। বাবার পূজার ঘরে কেউ ঢুকতে পারে না। খুব নিয়ম-টিয়মের পক্ষপাতী বাবা। কথা যদি বলেন, তোমার ভাল নাম? সোনালী যদি বলে, সরকার অথবা মিত্র, তা হলেই গেছে। বাবা গম্ভীর হয়ে যাবেন। গম্ভীর হবেন এই ভেবে পুত্র তার সঙ্গে তঞ্চকতা করেছে। বাবা হিসাবে তিনি ব্যর্থ। এবং এই এক রোগ বাবার। কোন কারণে কষ্ট পেলে দুদিন উপবাস দেবেন। কিছুই খাওয়ানো যাবে না। বলবেন, পাপ ছিল গত জীবনে। তারই ফল। এবং প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য দুদিন নিরম্বু উপবাস।

তার সঙ্গে এখন সোনালীর দেখা হওয়া দরকার। এত সব রাস্তায়ই ভাবা উচিত ছিল তার। তখনই পাঠ দেওয়া উচিত ছিল। সোনালী বেশ নিজের বাড়ির মতো তখন বাথরুমের দিকে যাচ্ছে। চোখে-মুখের সব ক্লান্তি কোন এক যাদুকরের স্পর্শে সব ধুয়ে-মুছে গেছে।

সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ডাকল, সোনালী।

—আপনি ডাকছেন।

—শোন।

—কী।

—ঠাকুরঘরে কিন্তু বাবা তোমার সব ইতিহাস নেবে। তুমি বলবে চক্রবর্তী। সোনালী চক্রবর্তী। কিন্তু সুবন্ধুর বাবার নাম? হয়ে গেল। ফাঁস হয়ে যাবেই। এখন মনে হচ্ছে সুবন্ধুর নাম করে সে ভাল করেনি। তবে কি বলত, আর কোন বন্ধুবান্ধব যাদের নাম সে জানে, বাড়িতে জানে, অথচ মূর্তিমান নিজে কখনও এখানে আসেনি। কিন্তু এখন হাতের সুতো ছেড়ে দিয়েছে। লাভ নেই। সে বলল, তুমি বল কিন্তু, সোনালী চক্রবর্তী।

—বলব।

—আর শোন।

—কী!

এখন আর কে দেখলে বলবে এই মেয়ে রাস্তায় বমিটমি করেছে। কে বলবে, সোনালী তার আত্মীয় নয় নিখিল কি বলবে ভেবেছিল— কিন্তু এই মুহূর্তে আর মনে করতে পারল না আবার কেন ডাকল সোনালীকে। সে ফের কি ভেবে বলল, যাও। তারপর সোনালী চলে যেতেই আবার ডাকল, বলল, তুমি বলবে দাদার সঙ্গে হাজারদুয়ারী দেখব বলে এসেছি। বলেই সে থেমে গেল। সোনালীকে আর কি নির্দেশ দেবে ঠিক করতে পারছে না।

সোনালী বলল, আর কিছু বলবেন না?

—না, মানে তুমি না ফেঁসে যাও।

সোনালী হাসল। বলল, আপনি বড় ভীতু মানুষ।

নিখিল সোনালীর দিকে না তাকিয়েই বলল, তা হবে। এখন যত তাড়াতাড়ি বাড়ি ছাড়া যায়। কাল সকালেই রওনা হব।

—হাজারদুয়ারী দেখবেন যে বললেন।

নিখিল বলল, খুব সাহস। দেব পুলিসে ধরিয়ে!

সোনালীর মুখটা সহসা আবার কেমন গুম মেরে গেল। হয়ত সেই মানুষটার কথা তার মনে পড়ে যাচ্ছে। নিখিল বুঝতে পারল কোন কারণেই আর আগের প্রসঙ্গ টানা ঠিক হবে না। ভেতরে একটা নরম জায়গা রয়েছে মেয়ের। সেখানে যে কেউ হাত দিলে তার লাগে। নিখিল বলল, ঠিক আছে। যাও। সোনালী চলে গেল। নিখিল একটা তোয়ালে জড়িয়ে পুকুরের দিকে হেঁটে গেল। মাথায় কিংবা শরীরে সে কখনও তেল মাখে না। একটা গন্ধ সাবান সঙ্গে। সে পুকুরের পাড়ে আসতেই মনটা হালকা হয়ে গেল। এই এক স্বভাব নিখিলের। গাছপালার মধ্যে ঢুকে গেলেই মন প্রসন্ন হয়ে যায়। সোনালী ধরা পড়লে বড়ই অসম্মানের প্রশ্ন দেখা দেবে। কেন জানি সে বুঝতে পেরেছে, সোনালীর এই আত্মহত্যার খবর সে আর কাউকেই বলতে পারবে না। বললে সোনালীকে খুবই ছোট করা হবে। ঠিক

ছোট করা হবে বললেও ভুল হয়, যেন এর চেয়ে বড় অপমান সোনালীর আর কিছু নেই। গাছপালার মধ্যে ঢুকে যেতেই মনে হল, সে কোন অন্যায় কাজ করেনি। যদি কথাবার্তার এদিক-ওদিক হয়ে যায় তবে বাবাকে ডেকে নিভৃতে সত্যি কথাই বলবে। বাবা সব শুনলে আর রাগ করতে পারবেন না। কারণ সে বুঝতে পারছে সোনালীর ব্যবহারে বাবা ইতিমধ্যেই গলে গেছেন। আজকালকার মেয়েরা হাঁটু মুড়ে কখনও প্রণাম করে—বাবার বিশ্বাসের বাইরে। সোনালী বাবার কাছে আগেই পঞ্চাশ নম্বর হাতিয়ে নিয়েছে। সে জানে তার বাবা ধর্মভীরু মানুষ। যদি সে বলে দেয়, বাবা আপনিই বলুন, এ-অবস্থায় আমার এ-ছাড়া আর কি করণীয় থাকতে পারে এবং আপনিই বলুন আমি ঠিক করেছি কি বেঠিক করেছি—তা-ছাড়া বাবা, এ-কথা গোপন রাখা দরকার—আর কেউ জানলে সোনালীকে খুবই ছোট করা হবে। আপনি আর আমি জানলাম।

নিখিল দাঁত ব্রাশ করছিল। ঘাটের সিঁড়িতে সে বসে বসে এমন সব ভাবছিল। ভাবছিল ভারি রহস্যময় একটা পথ ওর সামনে খুলে যাচ্ছে। মেয়েদের কাছে সে ভীতু গোছের মানুষ -অথচ সোনালীকে সে যে-ভাবে নিয়ে এল বাড়িতে তাতে করে নিজের সাহসের জন্য সে সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছে।

সে জলে নেমে গেল। ডুব দিল জলে, সাঁতার কাটল। আর সাঁতার কাটার সময়ই দেখল সোনালী পুকুর পাড়ে নেমে এসেছে। সঙ্গে গীতা।

—আপনার চান করতে কতক্ষণ লাগে ?

—তোমার চান হয়ে গেল ?

—কখন।

—আমি তো এই নামলাম।

গীতা বলল, মা ভাত বেড়ে বসে আছে।

নিখিল ভাবল, তবে কি সে চুপচাপ অনেকক্ষণ ঘাটটায় বসেছিল তার কি কোন সময়ের হিসাব ছিল না ! সে কি সোনালীকে নিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ছে। অথচ আশ্চর্য মেয়েটার মধ্যে কোন আশঙ্কার চিহ্ন নেই

মেয়েরা বোধ হয় সহজেই সব ভুলে যেতে পারে। সে বলল, বাবা তোমাকে ডেকেছিল। গেছিলে ?

সোনালী বলল, হ্যা।

—কি বলল ?

—ঠাকুরের চরণামৃত দিলেন। বললেন, খাও।

—আর কিছু না ?

—না। ও হ্যাঁ, আর বললেন, ছুটো রক্তজবা দাও তো।

—দিলে।

—দিয়ে এসেছি।

নিখিল জল থেকে উঠে এল। তোয়ালে দিয়ে শরীর ঢেকে নিল। সোনালী স্নান করে চুল ছেড়ে দিয়েছে। সাদা জমিনে লতাপাতা আঁকা একটা সিল্ক পরেছে। নিজেব সঙ্গে মাসিব বাড়ি যেতে হলে যা যা দরকার সোনালী তাই সঙ্গে নিয়েছে। এবং এমন সুন্দর সাদা সিল্কে সোনালীকে এত পবিত্র দেখাচ্ছিল যে মনেই হয় না আত্মহত্যা করার আগে কেউ নিজের পোষাক সম্পর্কে এত সচেতন থাকতে পারে। সোনালী ঠিক জানে, এই শাড়িটাতে তাকে দারুণ দেখায়। সে বোঝে শাড়িটা পরলে পবিত্র নারী হয়ে যায় সোনালী।

খেতে বসে নিখিল বলল, কানুকে দেখছি না।

সমিতা পাশে বসে খাচ্ছিল। তারপর সোনালী এবং শেষে গীতা। এ-রকম সময়ে কানুরও খাবার কথা সে নেই।

সমিতাই বলল, কানুর টিম জিয়াগঞ্জে খেলতে গেছে। কাল আসবে।

কানুর জীবনে একটাই স্বপ্ন। বড় খেলোয়াড় হবে। ইস্টবেঙ্গলে খেলবে। সে জীবনে আর কিছু চায় না। ওর ঘরে বড় বড় খেলোয়াড়দের ছবি। সকালে উঠেই সে ছবিগুলিতে ধূপ-ধুনো দেয়। মানুষ মরে গেলে তার ছবিতে ধূপ-ধূনো দিতে হয় কানু সেটা বোঝে না।

নিখিল বাড়িতে আজ রান্নার মেয়েটিকেও দেখছে না। মাকেই এক হাতে সব করতে হয়েছে। মেসের একঘেয়ে খাওয়া—এখানে কত সামান্য জিনিসে মা অমৃতবৎ খাবার তৈরি করে রাখতে পারে। থোড়ের

ছেঁচকি দিয়েই সে সবটা ভাত খেয়ে নিতে পারে। মুসুরডালের বড়া দিয়ে মটর শাক, মুগের ডাল আর বড় ট্যাংরা মাছের ঝাল। সে খেতে খেতে একবার সোনালীর পাতের দিকে তাকাল। সোনালী কেমন সংকোচের সঙ্গে খাচ্ছে। খুব কম নিচ্ছে। মাকে কিছুতেই বেশী কিছু দিতে দিচ্ছে না। সোনালী কি এ-সব খাবার পছন্দ করে না? সোনালীদের বাড়িটা নিশ্চয়ই খুব ছিমছাম। ঠিক এখানকার মতো তারা নিশ্চয়ই আসন পেতে খায় না। অথচ নিখিল কেন জানি আসনে বসে খেতে যতটা আরাম পায় টেবিলে বসে তা পায় না। আসনে বসলেই মনে হয় নিশ্চিন্তে অনেকক্ষণ বসে খাওয়া যাবে। কোন তাড়াহুড়োর ব্যাপার নেই।

সে বলল, এই সোনালী, খাচ্ছ না কেন? লজ্জা কি!

সোনালী আড়চোখে তাকাল। মেয়েটার যে আত্মহত্যা করার কথা ছিল! অথচ সেই মেয়েটা এখন তাদের সঙ্গে বসে ভাত খাচ্ছে। বোধ হয় খুবই কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ছে সোনালী।

আর সোনালীর কি করে যে ধারণা হয়ে গেছে নিখিলের জন্যই সে বেঁচে গেছে। কিন্তু রাস্তা জখমী না থাকলে ওর বোধ হয় বমি হত না। আসলে জখমী রাস্তাটাই ওকে বাঁচিয়েছে। তা ছাড়া সোনালী এখন যতটা নিশ্চিন্ত, যেন সোনালীর এটাই বাড়ি ঘর—তার আর কোথাও যাবার কথা নেই—তার বাবা মা-রা আছেন, তাঁরা খোঁজাখুঁজি করতে পারেন—সোনালীর আচরণে তা এতটুকু ফুটে উঠছে না। নিখিলের এখন যত সত্বর সম্ভব সোনালীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া দরকার। কারণ মাসিরা যদি কেউ সহসা আজই সোনালীদের বাড়ি বেড়াতে আসে, অথবা অন্য কেউ এবং যদি বলে দেয়, না, সোনালী রাণাঘাটে যায়নি—তখন কি হবে! সে মাকে বলল, কালই আমরা চলে যাব মা। সমিতার দিকে তাকিয়ে বলল, তোরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। তিনটের বাসে চলে যা। মুর্শিদাবাদটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আন সোনালীকে। হাজারদুয়ারী দেখবে বলে এসেছে। এত করে বললাম, পরে একবার এস, এবারে গিয়ে একদিনের বেশী থাকতে পারব না—তবু নাছোড়বান্দা। আসবেই।

সোনালী বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে নিখিলের দিকে। সে ঠিক নিখিলের বানানো গল্পের সঙ্গে তাল দিতে পারছে না। কি বলবে বুঝতে পারছে না। তার এখন কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। এখন শুধু তার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। সে কি-ভাবে যে বলবে, না নিখিলবাবু, আমি কোথাও যাব না। আমি এখন ঘুমোব। আপনি আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে বলবেন না।

নিখিলবাবু তখনও ওর দিকে তাকিযে, বলছে, যাও ঘুরে এস তবে।

সোনালী বলল, অবেলায় আর যাব না। বাসে এতদূর এসে কেমন লাগছে শরীরটা।

শৈল বলল, তা তো লাগবেই। শরীরে কিচ্ছু থাকে না। একবার তোমার মেসোমশাইর সঙ্গে তারাপীঠে যেতে আমার কি বমি!

নিখিল ভাবল, এই রে! সেই বমি। সে বলল, খেতে বসেছি, আর তুমি যে কি সব বলছ!

শৈল বুঝতে পারল, ছেলে তার এ-সব কথা পছন্দ করছে না। ছেলের সামান্যতেই বড় বেশী ঘৃণা। ফলে শৈল অন্য কথায় এল—সোনালী, আর দুটো ভাত খাও।

সোনালী বলল, না মাসিমা!

—কিছুই তো খেলে না।

গীতা টক দিয়ে খাচ্ছে, গীতার খুব তাড়াতাড়ি খাবার স্বভাব। এখনও সোনালীর মাছ দিয়েই খাওয়া হয়নি। বড় কম ভাত খাচ্ছে। প্রায় খাচ্ছে না। গীতা সোনালীর দিকে তাকিয়ে বলল, সোনালীদি ঘটি। আমাদের রান্না ভাল লাগবে না।

শৈলব একটা জায়গাতেই জীবনের সব অহংকার—রান্না ছাড়া শৈলর জীবনে আর কোন অহংকার নেই। বড় ভাল হাত রান্নার। যেই খায় নাম করে। এমন একটা গৌরব হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে বলে শৈল বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।—খুব খারাপ হয়েছে রান্না!

সোনালী বলল, না মাসিমা। খুব সুন্দর হয়েছে।

– তবে এত কম খাচ্ছ কেন!

নিখিল ভাবল, খাচ্ছে এই বেশী। যা রাস্তায় ক্যাসাদ বাধিয়েছিল তাতে করে ক'দিনে নিরাময় হবে সেটাই ছিল ভাবনার। এত অল্প সময়ে সোনালী এত স্বাভাবিক হয়ে যাবে নিখিল ভাবতেই পারেনি। না কি জীবনে সবারই থাকে অনেক রহস্যময় পথ। মানুষ একটা হারায়, একটা পায়। তার তো রহস্যময় পথ বলতে সেই গাছপালার ছায়াঘেরা পথটাই জানা আছে। সোনালী কি সেই রহস্যময় পথটার খবর পেয়ে গেছে। এ ছাড়া এত তাড়াতাড়ি নিরাময় হবার আর কি কারণ থাকতে পারে সে বুঝতে পারছে না।

নিখিল জেলাবোর্ড অফিসে যাবার সময় দেখল, বাবা পূজার ঘর থেকে বের হয়ে আসছেন। সে ঘড়িতে দেখল ঠিক তিনটে বাজতে দশ। তার দাঁড়াবার সময় নেই। সে সিঁড়ি ধরে নেমে আসার সময় শুনতে পেল. বাবা তাকে বলছেন, কোথায় যাচ্ছ?

—একটু কাজ আছে জেলা বোর্ড অফিসে।

—রাত করো না। তোমাদের বের হলে ফেরার নাম থাকে না।

সোনালী জানালায় দাঁড়িয়ে নিখিলের যাওয়া দেখছিল। একটা মানুষ কাছে না থাকলে কত একা লাগে এই প্রথম সোনালী যেন টের পেল। মানুষটা তার কেউ নয়। অথচ এক বেলার পথে মানুষটাকে সে নিরুপমের চেয়ে কম কাছের ভাবতে পারছে না। তখনই জ্বালা ভেতরে আর কি যে জ্বালা—সে যেন কেউ না থাকলে চিৎকার করে উঠত, নিরুপম, আবার আমি ডাঙ্গা পেয়ে গেছি।

নিখিল পেছনের দিকে তাকাতেই দেখল জানালায় সোনালী। কেমন বিষণ্ণ। ওর দিকে তাকিয়ে আছে। নিখিলের ভেতরটা সহসা কেমন করে উঠল। সে মুখ নামিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আসলে এখন দু'জন দুরাস্তায়। একজন সদর রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে—অন্যজন ঘরের মধ্যে শুয়ে দূরের আকাশ দেখছে। মানুষের সব সময় কিছু চাই। সে একা বাঁচতে পারে না। এ-সব ভাবছিল সোনালী। নিরুপমের সঙ্গে তার এক হঠকারী প্রেম চলছিল। নিরুপম শরীরে তার

আগুন জ্বালিয়েছিল—এবং সব নিয়ে নিরুপম বুঝেছিল শুধু রক্ত মাংসের শরীর। নিরুপমের সব আকর্ষণ তারপর থেকেই কমে কমে আসছিল—শরীরে জংঘায় সে খুঁজলে এখনও নিরুপমের চিহ্ন পাবে। আর তখনই ভেতরটা সোনালীর আবার হাহাকার করে উঠল। এই চিহ্ন এমন যে তার আত্মহত্যা বাদে গত্যন্তর ছিল না! কারণ দিন যত যাবে নিরুপমের চিহ্ন গায়ে দগদগে ঘায়ের মত ফুটে বের হবে।)

সোনালী ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে থাকল। সে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করেছিল। সে এও জানত, মৃত্যুর পরে তার লাশ নিয়ে কাটাছেঁড়া চলবে এবং সবই তখন দিবালোকের মত সত্য হয়ে যাবে। সে মানুষের কাছে ধরা পড়ে যাবে। সে একবার ভেবেছিল, গোপনে ভ্রূণটিকে হত্যা করা যায় কিনা। কিন্তু তার ভেতরে এমন এক মানসিক গঠন যে সে কিছুতেই সেটা করতে পারেনি। কি হবে বেঁচে আর নিরুপম যেদিন মুখের ওপরই বলল, না সোনালী, এটা তোমার ভাল কাজ হয়নি। আমাকে তুমি অযথা দায়ী করছ। তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের অভাব নেই। অর্থাৎ নিরুপম নিজের দায় পরের ঘাড়ে চাপিয়ে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। তারপরই মনে হয়েছিল সোনালীর, সে নিরুপমকে বিশ্বাস করে ঠকেছে। বাড়ি ফিরে সে প্রচণ্ড কেঁদেছিল। সে রাতে ঘুমোতে পারত না। মাথার মধ্যে কেবল আগুন জ্বলত। বাবা বলত, হ্যাঁরে সোনালী, তোর শরীরটা এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন রে। সে তখন চুপ করে থাকত। মাঝে মাঝে গাড়ি নিয়ে সে বের হয়ে যেত। একা ড্রাইভ করত। কোনদিন সে চলে যেত বারাসত পার হয়ে পামুনমুড়া পর্যন্ত। সেখানে তাদের একটা বাগানবাড়ি আছে, কিছু নির্জন গাছপালার মধ্যে চুপচাপ বিকেল কাটিয়ে বাড়ি ফিরে আসত। কোনদিন মনে হয়েছে এই গাড়ি নিয়ে সে উধাও হয়ে যায়—মনে হয়েছে এমন একজন মানুষ পাওয়া যায় না, যে তাকে তার দুঃসময় থেকে রক্ষা করতে পারে। তারপরই তার মনে হয়েছে—না কেউ নেই। বিশ্বাস করে পৃথিবীতে কাউকে কথাটা বলতে পারে তেমন লোক তার হয়তো কাছে নেই। বাবা মা'র কাছেও না। বাবা মা'র বিশ্বাস সে রাখতে পারেনি।) তাঁর

দেওয়া স্বাধীনতার দাম সে দিতে পারেনি। আর তখনই দেখল পূবের আকাশে একটা নক্ষত্র। সে ধড়ফড় করে উঠে বসল। নক্ষত্রটা বড় কাছাকাছি মনে হচ্ছে। সে বলল, আমি আপনাকে সব বলব নিখিলবাবু। দ্বিতীয়বার মরতে আর সাহস পাচ্ছি না। আপনিই আমার সেই মানুষ—যাকে সেই দুর্ঘটনার দিন থেকে খুঁজে আসছি।

ফেরার পথে রিক্সাতে নিখিল বলল, সোনালী, আমাদের বাড়ি তোমার কেমন লাগল?

—ভাল।

—আমরা বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাব।

সোনালী অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

—ভেবেছিলাম, স্টেশন থেকে তুমি তোমার বাড়ি চলে যাবে। আমি মেসে চলে যাব। কিন্তু রাতে ভেবে দেখলাম, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে না দিলে আমি মনে শান্তি পাব না।

সোনালী বলল, আমি ভাল মেয়ে নই নিখিলবাবু। আপনি আমার জন্য কেন এত করছেন!

নিখিল বলল, ধুস, ভাল মন্দ বলে কিছু আছে নাকি! আমি যে মন্দ লোক নই সেটাই বা তুমি কি করে জানবে।

—আপনি মন্দ হলে বেঁচে যেতাম।

নিখিল বলল, একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি। সল্টলেকে তুমি থাক। বাবা মা আছেন?

—আছেন।

—আর কে আছে?

—আর কেউ না।

—সল্ট লেকের কোন্ সেক্টরে আছ?

—দু-নম্বর সেক্টরে।

—তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ি গেলে বাবা-মা কিছু ভাববেন না তো?

—ভাবতে পারেন।

—তাহলে ?

—তাহলে যাবেন না।

—কিন্তু তোমার যদি ফের দুর্গতি হয়।

—তাতে আপনার কি ?

নিখিল ভাবল, সত্যি তো, তার কী! সে এত ভাবছে কেন! তারপরই মনে হল, না ভেবে তার আর উপায় নেই। জীবনে সে মেয়েদের কাছে কখনও ভিড়তেই সাহস পায়নি। এ-যেন তার জীবনে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। তাব আর নড়ার উপায় নেই।

নিখিল চুপ করে থাকল। স্টেশন বেশী দূবে নেই। গাড়ি আসারও সময় হয়ে গেছে। সে রিক্সাওয়ালাকে বলল, একটু তাড়াতাড়ি চালাও। ট্রেনটা যে করেই হোক ধরতে হবে।

স্টেশনে এসে নিখিল সোনালীর কথায় আশ্চর্য হযে গেল। সোনালী বলল, চলুন ওয়েটিং-রুমে বসব।

—এখন বসার সময় নেই। ট্রেন এসে যাচ্ছে।

—আসুক।

—আমরা ট্রেন ফেল করব। সব ট্রেনই মানুষ ধবতে পারে না।

সোনালীর এই সব হেঁয়ালি নিখিলের ভাল লাগছে না। কিন্তু আশ্চর্য সোনালী সত্যি ওয়েটিং-রুমেব দিকে হেটে যাচ্ছে। নিখিল ডাকল, সোনালী!

সোনালী হেটে যাচ্ছে। ফিরেও তাকাচ্ছে না।

সে ফের বলল, আমি টিকিট কেটে আনছি।

সোনালী সত্যি ওয়েটিং-রুমে ঢুকে গেল তখন। নিখিল ঘড়ি দেখে বুঝল, টিকিট কেটে এসে ট্রেন হয়ত ধরা যাবে না। তবু টিকিট কেটে রাখা দরকার। যদি আবার সোনালীর মর্জি হয়, না এই ট্রেনেই চলুন।

সে টিকিট কেটে এসে দেখল, ওয়েটিং-রুম ফাঁকা। আরে, মেয়েটা গেল কোথায়! সে দৌড়ে বাইরে এল। না, প্ল্যাটফরমের কোথাও নেই। তবে কি মেয়েটা আবার উধাও হয়ে গেল। অথবা কোথাও

ফের ডুব মারার জন্য সরে পড়ল! নিখিলের ভেতরটা কেমন হাহাকারে ভরে যাচ্ছে। সে পাগলের মত ছুটাছুটি করছে প্ল্যাটফরমে—আর তখনই পাশ থেকে সোনালী বলল, কোথায় যাচ্ছেন?

—তুমি কোথায় গেছিলে? ওয়েটিং-রুমে নেই।

সোনালী দেখল মানুষটার সারা মুখ দুশ্চিন্তায় ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল। তাকে দেখেই আবার সব দুশ্চিন্তা নিরাময় হয়ে গেল সহজে। ছেলেমানুষের মত বলল, সোনালী, তুমি আমাকে দেখছি মেরে ফেলবে!

সোনালী বলল, আমি বাথরুমে ছিলাম। তারপর আর বলতে পারল না—আপনি খুবই ছেলেমানুষ। একটুকুতেই দেখছি খুব ভেঙে পড়েন।

সোনালী মনে মনে বলল, ঈশ্বর, এমন ভালমানুষ নিয়ে আমি কি করব! শঠ প্রবঞ্চক হলে খেলা জমত। ঈশ্বর, আমি একবার স্থির বিশ্বাসে ডুবে গেছিলাম, মনুষ্য জাতি বড়ই ইতর। আমার মনে হয়েছিল, যদি বেঁচে থাকি, যদি শরীর থেকে সত্যি ভ্রূণ উৎপাটন করি, তবে অনেক পুরুষকে আমার জ্বালায় পুড়িয়ে ছারখার করব। ঈশ্বর, আপনি আমাকে অগাধ সৌন্দর্যের অধিকারী করেছেন। আর তখনই সোনালী দেখল, ট্রেনটা আসছে নিখিল তার পাশে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দিতে গেলেই খপ করে ধরে ফেলবে। সোনালীর ভারি হাসি পেল কথাটা ভেবে। সে আর মরতে পারছে না। তার মরার অধিকারটুকুও কখন গোপনে নিখিল হরণ করে নিয়েছে।

ট্রেনটা ইন করলে সামনের একটা ফার্স্ট ক্লাসের কামরা দেখে সোনালী লাফিয়ে উঠে গেল।

নিখিল বলল, এই, নেমে এস। আমাদের সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট। ওটাতে উঠলে চেকার ধরবে।

সোনালী গা করল না। সে সোজা গিয়ে একটা ফাঁকা মত জায়গায় বসে গেল তারপর নিখিল উঠছে না দেখে জানালায় মুখ বাড়িয়ে বলল, ও মা, দাঁড়িয়ে কেন, উঠে আসুন।

—আরে, তুমি দেখছি আমাকে বিপদে ফেলে কেবল তামাসা দেখতে চাও।

সোনালী বলল, আপনি আসুন তো।

—আমার বাড়তি টাকা নেই সোনালী।

—সে দেখা যাবে। আপনি উঠুন তো। তা না হলে এক্ষুণি পুলিসে খবর দেব। বলেই হা-হা করে হাসতে থাকল।

যে মেয়ে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে তার পক্ষে সবই শোভা পায়। অগত্যা নিখিল উঠে পড়ল। এবং সোনালীর পাশে বসতেই দেখল, একেবারে ফাঁকা কামরা। অন্য কোন আর যাত্রী নেই।

সোনালী যেন এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। বলল, যাক, বেশ সুন্দর একটা জায়গা পাওয়া গেল।

—ফাঁকা জায়গা বের করে দেবে। চেকার এল বলে।

সোনালী এ-সব কথায় কর্ণপাত করল না। শুধু বলল, এমন ফাঁকা না থাকলে এ-ট্রেনে যেতামই না। আপনাকে আমার খুব নিরিবিলি দরকার।

—খুব গোপন কথা আছে বুঝি!

সোনালীর মুখটা মুহূর্তে আবার বিষণ্ণ হয়ে গেল। ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। হুইসিল বাজছে। বহরমপুর স্টেশনে সোনালী জীবনেও আসেনি। গতকাল সকালেও তার পৃথিবীতে বহরমপুর স্টেশন বলে কোন জায়গা ছিল না, নিখিল বলে কোন মানুষের আবাস ছিল না সেখানে। আর কি করে যে সব পাল্টে গেল। সে তার ভবিতব্যের কথা ভেবে খানিকক্ষণ মগ্ন হয়ে থাকল নিজের মধ্যে। নিখিলের দিকে একবারও তাকাল না। একটা কথাও বলল না।

—আমার যে কি ভয়ে কেটেছে।

—কিসের ভয়!

—কখন ফাঁস হয়ে পড়বে।

—পড়লে ভাল হত নিখিলবাবু। ওরা জানত, আমি সত্যি ভাল মেয়ে নই।

নিখিল সামান্য বিরক্ত গলায় বলল, আচ্ছা সোনালী, বার বার এক কথা বল কেন বল তো?

—খারাপ মেয়ে, খারাপ বলব না ?

—বলেছি তো, পৃথিবীতে খারাপ ভাল রিলেটিভ ব্যাপার। ও নিযে মাথা ঘামালে চলে না।

এবার একটা বড় শস্যক্ষেত্র দু-পাশে রেখে ট্রেন দ্রুতবেগে ছুটছে। কামরায় দুজন নারী-পুরুষ। সোনালীর চুল হাওয়ায উড়ছে। আঁচল বুক থেকে খসে পড়ছিল। কেমন অগোছালো এক যুবতী নারীর ছবি সোনালীর সারা অবযবে।

নিখিল বলল, বোনদের খুব পছন্দ হয়েছে তোমাকে।

সোনালী বলল, আপনার ?

নিখিল আসলে কথাটা কিছুই ভেবে বলেনি। সোনালীর ব্যবহার বোনদের খুব ভাল লেগেছে। আসার সময বার বার বলে দিয়েছে. আবার কিন্তু আসবে সোনালীদি। দাদার সঙ্গে চলে আসবে। আমরা সব জাযগা ঘুরিযে তোমাকে দেখাব। দাদা না নিযে এলে একাই চলে আসবে। সোজা বহরমপুর—তারপর এখানে। কোন তোমার অসুবিধে হবে না। চিঠি দিলে আমরা স্টেশনে গিযে থাকব। এত সব কথার ভিত্তিতেই নিখিল বলেছিল কথাটা। কিন্তু এখনও সোনালী যে ভাবে তাকিযে আছে তাতে যে সে কি বলে! কেমন কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খাওযা মানুষের মতো বলল, পুরুষ মানুষের আবার ভাল-মন্দ।

কথাটাতে সোনালী একটু হকচকিয়ে গেল। কথাটা কেমন বেখাপ্পা ধরনের অথবা অসংলগ্ন। এমন ভাল মানুষেব কাছ থেকে সে এ জবাব প্রত্যাশা করেনি।

ওরা দুজনই এখন মুখোমুখি বসে। ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থেমেছে। কিছু সব্জি উঠছে এখান থেকে এবং কিছু যাত্রী। নিখিল বলল, চা খাওযা যাক।

সোনালী বলল, আপনি খান। আমার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

—আরে খাও। কিছু হবে না।

সোনালীর মনে এক দুরন্ত আবেগ এখন খেলা করে বেড়াচ্ছে। তার বড় নিরিবিলি দরকার ছিল মানুষটাকে। সে তাকে নিরিবিলি পেযেও

গেছে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না নিখিলকে কি ভাবে সে কথাটা বলবে। আর নিখিলও আশ্চর্য মানুষ—গতকালের ঘটনা নিয়ে কোন কথাই বলছে না। সে গতকাল মরে যেতে চেয়েছিল সে সম্পর্কে যেন মানুষটার কোন কৌতূহল নেই। এমন নিরুদ্বিগ্ন মানুষের সঙ্গে কতক্ষণ আর চুপচাপ বসে থাকা যায়। সে অগত্যা বলল, আপনি খুব স্বার্থপর মানুষ।

নিখিল চা এগিয়ে দিয়ে বলল, তা তুমি যা খুশী বলতে পার।

—আমাকে আপনি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন কেন ?

—তবে কোথায় দেব !

—একাই যেতে পারব।

—যেতে পারবে ঠিক। তবে শেষ পর্যন্ত সেটা কালকের মত হয়ে গেলে আমার আপশোষের অন্ত থাকবে না।

—বাবা আপনাকে চেনে না।

—কিছু একটা পরিচয় দেবে।

—আমি আপনার মত বলতে পারি না।

নিখিল কেমন আহত হল কথাটাতে। বলল, তোমার কোন বন্ধু-বান্ধব বলবে।

—তা বলতে যাব কেন ?

—কিন্তু সোনালী, কালকের ঘটনার সাক্ষী একমাত্র আমি। আর কেউ জানে না। মানুষের ভীষণ কিছু না হলে মরে যেতে চায় না।

—আমার জন্য আপনার খুব ভাবনা দেখছি।

নিখিল চুপ করে থাকল। চা খাচ্ছে। বাইরে একটা লোক নীল ফ্ল্যাগ নিয়ে দৌড়াচ্ছে। ট্রেনটা নড়ে উঠল।

সোনালী বলল, কী, জবাব দিচ্ছেন না কেন ?

নিখিল বলল, তুমি সব কিছুই বলতে পার। যে মেয়ে মরে যেতে ভয় পায় না, সে সব কিছুই পাবে।

সোনালী চিৎকার করে বলল, আমি পুরুষ মানুষদের আর বিশ্বাস করি না। আপনাকেও করি না।

কেমন অসংলগ্ন কথাবার্তা সোনালীর। সোনালীর চোখ-মুখ কান্নায় কেমন ভরে যাচ্ছিল।

—আমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না সোনালী। তোমাকে পৌঁছে দেওয়া আমার কাজ। তারপর তুমি যেখানে খুশী যাও আমার কিছু বলবার থাকবে না। বিবেকের কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না।

সোনালী কেমন ভেঙ্গে পড়ল এবার—আমি বাড়ি যাব না।

সোনালী উঠে দরজার দিকে যাচ্ছিল।

—এই সোনালী, কোথায় যাচ্ছ। কি পাগলামি হচ্ছে। বলে জোর করে হাত ধরে ফেলল।

কিন্তু সোনালীর মধ্যে সেই ভ্রূণের দায় ভয়ঙ্কর এক অগ্নিকাণ্ড লাগিয়ে দিয়েছে। সে ভেবেছিল, এই ভাল মানুষটিকে সব খুলে বলবে। কিন্তু একজন যুবতীর পক্ষে সেটা যে কত কঠিন এই প্রথম টের পেল। কিন্তু কতদিন গোপন রাখতে পারবে। সে ভেবেছিল একজন মেয়ে ডাক্তারকে বলবে সব—তারপরেই নিজের ওপর এক অতিশয় ঘেন্না তাকে মরিয়া করে তুলেছে। সে ভেবেছে তার এই দায় বহন্ করা বড়ই কঠিন। বাবার শিশুর মত সারল্যের বিশ্বাস সে রাখতে পারেনি। আবার সেই প্রিয় পিতার সামনে গিয়ে তাকে দাঁড়াতে হবে ভাবতেই মাথার শিরা উপশিরায় রক্তপাত আরম্ভ হয়ে গেল।

আসলে এ সবের মধ্যেই একটা ধস্তাধস্তি চলছিল ট্রেনে। দ্রুতবেগে সে অনন্ত যাত্রায় যেন চলেছে। নিখিল বুকের মধ্যে জড়িয়ে রেখেছে সোনালীকে। দুহাতে সাপ্টে জড়িয়ে রেখেছে, যেন সোনালী কোন অঘটন ঘটাতে না পারে। সারা মুখে সোনালীর পাগলের মত ভাব। হাত-পা ছুঁড়ে বলছে, আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে যেতে দিন।

—কি হয়েছে বলবে তো।

—আমি আর বাড়ি যাব না নিখিলবাবু। বাড়ি যাবার, বাবার কাছে দাঁড়াবার আমার আর মুখ নেই।

—তোমার বাবাকে সব বুঝিয়ে বলব।

সহসা নারীর সেই অনন্ত রহস্যময়তা খুলে গেলে যা হয়, সোনালীর

ধো তাই ফুটে উঠল। সে নিজেকে আলগা করে রাখতে চাইল। প্রচণ্ড বিদ্বেষ চোখে-মুখে। সে বলল, ছাড়ুন। ধরে রেখেছেন কেন। ছাড়ুন বলছি।

নিখিল কিংকর্তব্যবিমূঢ। সে কেন যে গতকাল এই ঝামেলায় জড়াতে গেল। সে ছেড়ে দিয়ে বলল, দোহাই সোনালী, তুমি আর যাই কর, জীবন নাশ কর না।

সোনালী দেখল, নিখিলের চোখে সরল ভালবাসার চিহ্ন। সে মাথা নিচু করে ফেলল। বলল, নিখিলবাবু, আপনি আমাকে কেন এত ভালবাসলেন। কেন কেন? বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সোনালী।

নিখিল সোনালীর হাত ধরে বলল, এস।

সোনালী হাত ছাড়াতে পারল না। সে কেমন মন্ত্রমুগ্ধ বালিকার মত ওর হাত ধরে টানতে থাকল।

নিখিল বলল, বস।

সোনালী সুবোধ বালিকার মত বসে পড়ল।

—তুমি আমাকে সব বলতে পার।

সোনালী মুখ না তুলেই বলল, মানুষ মরে যেতে চায় কেন নিখিলবাবু।

নিখিল বলল, মরার কথাটা ভুলে যাও। মাথা থেকে ওটা সরিয়ে দাও। আমার দিকে তাকাও।

—আপনি সব জানলে এ কথা বলতে পারতেন না।

—সোনালী, আমি সব জানি। আমি সব বুঝি। তুমি যে জন্য ভাবছ, ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

—আপনি টের পেয়েছেন?

—হ্যাঁ। তোমাকে খুব ভাল করে দেখলে টের পাওয়া যায়।

সোনালী আর কথা বলতে পারল না, ট্রেন আবার কিছু গ্রাম মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে।

নিখিল বলল, আমি আবার একটা নতুন রহস্যময় পথের খোঁজ পেলাম।

সোনালী মাথা নিচু করে বসে আছে। সারা মুখে গ্লানি, চোখদুটো বোজা।

নিখিল ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে টের পেল আশ্চর্য সুঘ্রাণ মেয়ের শরীরে। সব কিছুই তার ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে এ মুহূর্তে। সে সোনালীর হাত নিজের হাতে তুলে নিল। বলল, তুমি ভারি পবিত্র সোনালী। তোমার সব কিছু আমার কাছে অত্যন্ত পবিত্র। এত বড় সত্য আমি আর কখনও উপলব্ধি করিনি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার।

সোনালী জানালায় মাথা রেখেছে। আর আশ্চর্য এক অধীর কান্না বুক বেয়ে উঠে আসছে। কান্না গোপন কবার জন্য আচলটা মুখের ওপর ফেলে দিল।

নিখিল মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে বলল, আমাকে শুধু দেখতে দাও। আমি আর কিছু চাই না।

স্টেশনে নেমে নিখিল দেখল, চাবপাশে গভীর অন্ধকার। শুধু স্টেশনে টিমটিম করে কিছু আলো জ্বলছে। সোনালী পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কোন কথা বলছে না। নিখিল ঠিক ভেবে উঠতে পারছে না কি করবে। কারণ ক্ষণে ক্ষণে সোনালীর কেমন চেহারা পালটে যায়। জেদি বালিকার মত বায়না। না যাবেন না, যাওযায দবকার নেই। আবার কেমন চুপচাপ হয়ে যায়। সাবা ট্রেনে এই করতে করতে এতদূর আসা। সোনালীকে একা ছেড়ে দেবে না সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত যাবে। সারা ট্রেনে দু-পাশের গাছ-পালা মাঠ দেখতে দেখতে সে এই চিন্তাতেই মগ্ন ছিল। একবার বলেছিল, স্টেশন থেকে একা যেতে পারবে ত! সোনালী কোন জবাব দেয়নি। সারা ট্রেনে সোনালী কেবল কি ভেবেছে। নিখিল সোনালীব দিকে তাকালেই দেখেছে, কখনও ভারি স্থির মেয়েটি, কখনও উদাস। কখনও চোখে-মুখে উত্তেজনা। যেন আবার যে কোন মুহূর্তে কিছু একটা করে বসবে।

তবু নিখিলের ধারণা ছিল, গাড়ি থেকে নামলেই সে দেখতে পাবে

আলো ঝলমল রাস্তা। মানুষজন, বাস, মিনিবাস দোকান-পাট মিলে আলোর মধ্যে কোন নিশ্চিন্ত যাত্রা। সোনালী একা চলে গেলেও কোন ভয়ের কারণ থাকবে না। আলো মানুষকে বাঁচতে শেখায়। আলো মানুষের কাছে জীবনের চেয়ে বড় কিছু। এবং এই আলোর মধ্যে সোনালী আর দ্বিতীয়বার আত্মহত্যার চেষ্টা নাও করতে পারে।

অথচ এখন লোডশেডিং। সে ধীরে ধীরে হাটতে থাকল। রেল ব্রীজ পার হয়ে আপাততঃ রাস্তায় নেমে যা হয় কিছু ঠিক করা যাবে। সে বলল, এস।

সোনালীর যেন কিছু করণীয় নেই। নিখিল এখন যা বলবে সে তাই করবে। মানুষটা দু দিনে বড় নিজের কাছের মানুষ হয়ে গেছে। সে নিখিলের পাশে পাশে হাঁটতে থাকল। ওরা সিঁড়ি ভেঙ্গে ক্রমে ওভার ব্রীজে উঠতে থাকল। অনেক উঁচুতে উঠতে সোনালীর কেমন হাঁপ ধরে গেছিল। একবার বলল, একটু থামুন। পারছি না।

নিখিল পেছনে তাকিয়ে দেখল ব্রীজের রেলিং-এ কেমন ঝুঁকে পড়েছে সোনালী।

সোনালী কি ঝাঁপ দেবে। সে তাড়াতাড়ি সোনালীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এবং সামান্য রুষ্ট হল নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য।

অন্ধকারে সোনালী নিখিলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ওপরে আকাশ এখানে কত বড়। কত নক্ষত্রমালা। এবং দূরে দূরে রাস্তায় তারা দেখতে পেল গাড়ি, হেডলাইট জ্বলছে। অন্ধকারে হাঁড়কোর বাড়িগুলো আশ্চর্যরকমের স্থির, যেন সহসা জীবন থেমে গেছে।

স্টেশনে নামতে ওদের রাত হয়ে গেল। ট্রেন লেট। দিনে দিনে নিখিল ভেবেছিল, সোনালীকে বাড়ি পৌঁছে দেবে! তাকে একা ছাড়তে সাহস হচ্ছে না। অবশ্য ট্রেনে সোনালী বলেছে, আমি একাই বাড়ি যেতে পারব। আপনাকে যেতে হবে না। কিন্তু সে জানে, সোনালীকে কখনও বিশ্বাস করা কঠিন। কখনও মনে হয়েছে, সোনালী দ্বিতীয়বার আর কখনই মরতে যাবে না। কখনও আবার মনে হয়েছে, এ-মেয়ে

সব কিছু করতে পারে। আর দুদিনেই বুকের মধ্যে এক ভয়ংকর টান ধরে গেছে বলে সে নিচে নেমে বলল। কত নম্বর বাসে উঠব?

সোনালী বলল, চোদ্দর বি; নয় নম্বরও যাবে।

অন্ধকারে ওরা বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। বাস বড় দেবি করে আসছে। সোনালী বলল, ট্যাক্সি নিন।

বেশ রাত হয়ে গেছে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা লেট ট্রেন। বেথুয়াডহরির কাছে কোথায় লাইন আলগা হয়ে গেছে বলে এই দেরি। ঘামে জামা প্যান্ট ভিজে জবজবে। একটা ট্যাক্সি দেখে সে ছুটল, না যাবে না। চৌদ্দর বি. এল, ভিড়। সোনালী বলল, উঠতে পারব না।

এক সময় কেন জানি নিখিলের মনে হল, আসলে সোনালী বাড়ি ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছে। সোনালী যত বাড়ির কাছাকাছি আসছে তত ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা মেবে গেলেই ভয়। কি থেকে কি করে বসবে।

সোনালী ফের বলল, আপনি যান। আমি ঠিক একা চলে যাব।

নিখিলের কেন জানি এই মুহূর্তে মনে হল মেয়েটি ভাবি অস্থির স্বভাবেব। সময় সময় বড় হঠকারি—তার কখন কি মর্জি হবে কেউ বলতে পাবে না, দু'দিনে সোনালীর স্বভাব দেখে এটা তার মনে হয়েছে।

সে বলল, সোনালী, ওঠ।

সোনালী দেখল, নিখিল ট্যাক্সি ঠিক ধরে এনেছে।

ট্যাক্সিতে উঠে নিখিল বলল, কোথায় যাব বল।

সোনালী বলল, কোথায় যাব জানি না।

নিখিল এবার রুষ্ট গলায় বলল, সোনালী, তোমাদেব এদিককার পথ-ঘাট আমি চিনি না।—সে অন্ধকারে ঘড়ি দেখার চেষ্টা করল কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। রাত যে কম হয়নি সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। স্টেশন থেকে নেমেও প্রায় আধঘণ্টা পার হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে লোকজন কমে আসছে। সে কিছুটা অন্যমনস্কেব মত হয়ে পড়েছিল। হুঁশ হল ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথায়।—কোথায় যাবে স্যার?

নিখিলের মনে হল, সোনালী বলেছিল তাদেব বাড়ি দু নম্বর সেকটরে। নিখিল বলল, দু নম্বর সেকটবে চল। কত নম্বর ব্লক সে জানে না।

এই নতুন উপনগরীর রাস্তাঘাট ট্যাক্সিওয়ালাদেবও ভাল জানা নেই। কেউ দেখিযে না দিলে তাব পক্ষে ঠিক জাযগায পৌছানো শেষ পর্যন্ত কঠিন হবে। সব বাড়ি ঘর এক বকমেব, রাস্তাঘাট এক রকমেব। ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি সব হাল ফ্যাসনের। ড্রাইভার বলল, লাবণি যাবেন ?

সোনালী বলল, না।

তবে কোথায় যাবেন ?

ড্রাইভার এই সব মজাকি জীবন ভর ট্যাক্সি চালাতে গিয়ে টের পেয়েছে। সে বুঝতে পারছিল, বাবু বিবির কোথাও গণ্ডগোল আছে। সে বলল, স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন।

সোনালী কেমন মরিয়া হয়ে বলল, সুইমিং পুল চল।

—কোন্ দিকে ওটা !

—সেচ ভবনের কাছে।

এবারে গাড়ি হুস করে চলতে আরম্ভ করল। অন্ধকার। দু-পাশের দোকানে টিমটিম করে মোমবাতি জ্বলছে। কিছু বস্তির মতো দু-পাশে। মনে হল গাড়িটা একটা সাঁকোতে লাফিয়ে উঠল। তারপরই মসৃণ প্রশস্ত পথ। সোজা কিছুটা গিয়ে অন্ধকারে ড্রাইভাব কেমন রাস্তা গুলিয়ে ফেলল। বলল, বাঁ দিকে ঘুরব ?

সোনালী বলল, ঘোর।

নিখিল বলল, ঠিক বলছ ত!

সোনালী বলল, অন্ধকারে আমিও ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না।

সামনেই বড় একটা চার রাস্তার ক্রসিং। একটা কংক্রিটের দেযাল নতুন উঠছে। ডান দিকের বাড়িটাতে কেউ গ্যারেজে তালা লাগাচ্ছে। ক্রসিং-এ এসে ড্রাইভার বলল, ডান দিকে বোধ হয় ঘুরতে হবে।

নিখিল বলল, ডান দিকে বোধ হয় কেন ?

অন্ধকারে এদিকটায় আসিনি।

নিখিল নাড়া দিয়ে ডাকল সোনালীকে। বলল, এই ভ্যাখ আমরা কোথায় এসেছি। চিনতে পার কি না ভ্যাখ।

কেমন ঘুম থেকে ওঠার মতো সোনালী কাচের ভিতর দিয়ে দেখল বাইরেটা। সবই অপরিচিত। তারা এই শহরে মাস তিনেকও হয়নি এসেছে। এখানকার সব তার এখনও ঠিক চেনা হয়নি। রাস্তাঘাট এত সুবিশাল, যে কখনও কখনও মনে হয়েছে এই রাস্তায় বের হলে মানুষের আর ঘরে ফেরার ইচ্ছে থাকে না। সে বলল, একটু নেমে দেখুন না! বলবেন পাখির খাঁচা। এক নম্বর পাখির খাঁচা পার হয়ে যেতে হয়। দু নম্বর পাখির খাঁচার একটু আগে। সুইমিং পুল বললেও লোক ঠিক বলতে পারবে।

অগত্যা নিখিল কি করে। সে দরজা খুলে নেমে পড়ল। কাউকে দেখতে পেল না। এখানে বড় খোলামেলা আকাশ, সুবিশাল সব হাল ফ্যাসনের বাড়ি, নতুন চুণকামের গন্ধ। এত রাতে এমন একটা গোলক-ধাঁধায় পড়ে সে কিঞ্চিত বিমূঢ় হয়ে গেল। প্রথম বাড়িটাতে লোকজন আছে বলে মনে হল না। দ্বিতীয় বাড়িটার দোতলায় একটা মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে কোন যুবতী বই পড়ছে। দক্ষিণা হাওয়ায় জানালার লেসের পর্দা উড়ে গেলে যুবতীকে দেখা গেল। তারপর ডান দিকের একতলা বাড়িটার গেট খোলা। একবার ভেতরে ঢুকে কাউকে ডাকলে কেমন হয়। এমন সময় সে দূরে দেখতে পেল গাড়ির হেড-লাইট। কাছে এলে বুঝতে পারল, শেষ বাস। বাসের নম্বর দেখল, চোদ্দ-এ। তার মনে হল, ঠিক রাস্তায়ই বোধ হয় এসেছে।

সে ফিরে গিয়ে সোনালীকে বলল, মনে হয় আমরা ঠিকই এসেছি। একটা বাস গেল চোদ্দর এ। ওটার পেছনে পেছনে গেলে হয়।

সোনালী বলল, একেবারে উল্টো রাস্তা। আমাদের ওদিকটায় চোদ্দ-এ যায় না।

নিখিলের মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

ড্রাইভার বলল, আমাকে ছেড়ে দিন স্যার।

নিখিল খুবই বিচলিত বোধ করল। সে যেন পৃথিবীর একটা অন্য

ঠিকানায় এসে গেছে। সোনালী তাকে নিয়ে মজা করছে। না কি সত্যি সোনালী রাস্তাটা জানে না। সে গাড়িতে উঠে বলল, ডান দিকে এগোও। দেখি কি হয়।

ডান দিকে যেতে যেতে ওরা আর বাড়িঘর দেখতে পাচ্ছে না। ইট লোহা-লক্কড়, বালি পাথরের টাঁই। তারপর কাশের জঙ্গল। দিগন্তে রূপোলি আকাশ। নিখিল মনে মনে ভাবল, এ-কোথায় এলাম! আর সেই সময় এল এক মোটর সাইকেল আরোহী। ভট ভট শব্দ করতে করতে আসছে। নিখিল গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল। সোওয়ারি থামলে বলল, দেখুন, এখানে আমাদের রাস্তার একটু গোলমাল হয়ে গেছে। আমরা সুইমিং পুলের কাছে যাব।

সোওয়ারি তার মাথার হেলমেটটা একটু আলগা করে বলল, আমার সঙ্গে আসুন। খাঁচার পাশ দিয়ে আমি বের হয়ে যাব।

সোনালীর এ-সব কথায় যেন কোন উৎসাহ নেই। মাঠের ওপাশে চাঁদ উঠে আসছে। অন্ধকারে এক আশ্চর্য রূপময় আকাশের নিচ দিয়ে তাদের গাড়িটা এখন যাচ্ছে। সামনে এক মোটর সাইকেল আরোহী। মাথায় হেলমেট। কেমন একটা দূর পৃথিবীর গন্ধ সর্বত্র ম ম করছে। সোনালী বলল, আপনি আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে কি করবেন?

—সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে।

—ফিরবেন কিসে?

—কেন ট্যাক্সিতে।

বাতাসে আঁচল উড়ে যাচ্ছিল সোনালীর। সে আঁচল ঠিক করতে করতে বলল, বাবাকে কি বলবেন?

—এখনও ভেবে দেখিনি।

—কখন আর ভাববেন?

—সে দেখা যাবে।

—আমি মাসির বাড়ি গেছি বাবা জানে। আপনি অন্য কিছু জানেন। দুটো মেলাবেন কি করে!

এখন এ-সব কথা ভাবলে নিখিলের বিড়ম্বনা বাড়বে। সে ভাবল

আবার, দূর থেকে দাঁড়িয়ে শুধু দেখবে সোনালী দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেছে। তাবপর তার আর কিছু করণীয় থাকবে না। সে চলে যাবে।

সামনের মোটর সাইকেল আরোহী এক পায়ে ভর করে দাঁড়াল। গাড়িটা আসছে। এরা বোধ হয় এখানে নতুন। সে বলল, ঐ যে বা দিকটা দেখেছেন দূরে, ওখানে সুইমিং পুল। একটা পাখির খাচা পেছনে ফেলে আসছি। একটা ঐ সামনে। কত নম্বর ব্লক?

নিখিল সোনালীকে বলল, চিনতে পারছ?

সোনালী কিছু বলল না। গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে থাকল। নিখিল লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল, তুমি দাঁড়াও, আমি আসছি।

ড্রাইভার মিটার নামিয়ে দিয়ে বলল, স্যার দেরি হবে। আমাকে এক্ষুণি ফিরতে হবে।

নিখিল কি করবে বুঝতে পারছে না। রাস্তার ধারে একটাও বাড়ি নেই। কিছু মাঠ ভেঙে গেলে ইতস্ততঃ নতুন বাড়িঘব। কাশের জঙ্গল দিগন্তে চলে গেছে। হেমন্তের সময় বলে, কাশ ফুল সব মানুষ সমান উঁচু হয়ে আছে। সে ডাকল, সোনালী, দাঁড়াও।

সোনালী নেই। কাশেব জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কোন সরু পথ আছে কি না সে জানে না। সামান্য দূরেই এমন অন্তগত রহস্য থাকতে পারে নিখিলের জানা ছিল না। সে সোনালীকে দেখতে পাচ্ছে না, অথচ গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে।—আমি এখানে। আপনি ট্যাক্সি ছেড়ে দিন। মনোজ আপনাকে দিয়ে আসবে।

দূরে সেই মোটর সাইকেল আরোহীর চলে যাবার শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসছে। পৃথিবীতে এমন নির্জনতা আছে, এখানে না এলে টের পাওয়া যায় না। নিখিল ট্যাক্সিওলাকে বিদায় দিয়ে যে-কাশের জঙ্গলটায় সোনালী ঢুকে গেল সেদিকে হাঁটতে থাকল। কিন্তু সোনালীর আর সাড়া-শব্দ নেই। সে কেমন ভারি বিভ্রমের মধ্যে পড়ে গেল। মাঠের কাশফুলের গুচ্ছ কেবল দুলছে। হাওয়ায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে। জ্যোৎস্না

আকাশে বড় মায়াময় চারপাশটা। সে ডাকল, সোনালী, এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে ?

সোনালী কোথা থেকে যেন বলল, আসুন না।

যেন কাছেই সেই রহস্যময়ী নারী, যেন হাত বাড়ালেই তাকে খুঁজে পাবে—কি সুন্দর আকাশ আর জ্যোৎস্না—ভাগ্যিস লোডশেডিং ছিল, না হলে এমন এক মহিমময় জ্যোৎস্নায় সে সোনালীকে যেন আলাদা-ভাবে চিনতে পারত না। গতকালের সোনালী আর আজকের সোনালী যেন কত তফাৎ, ক্ষণে ক্ষণে সে তার খোলস পালটে ফেলছে। সে বলল, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।

—এই ত আমি।

—কোথায় ?

এই যে, বলে কাশের বন থেকে সে তার দু হাত ওপরে তুলে দিল। জ্যোৎস্নায় সে দেখল জলে ডুবে যাবার আগে কোন প্রতিমার হাত যেন ! সে কি সোনালীকে এখানে বিসর্জন দিতে এনেছে !

সে বলল, রাস্তাটা যে পাচ্ছি না।

সোনালী বলল, আমিও না।

—সোনালী ! নিখিল কেমন আর্ত গলায় কথাটা বলল।—তুমি রাস্তা খুঁজে না পেলে চলবে কেন ? রাস্তাটা খুঁজে বের করতেই হবে।

সোনালী সেই অদৃশ্য লোক থেকেই বলল, আসুন, দু'জনে চেষ্টা করে দেখি।

এবং পথেই সে সোনালীকে পেয়ে গেল। আর একটা সরু রাস্তাও পেয়ে গেল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিখিলকে নিয়ে মজা করছিল সোনালী নাকি—এই যে মাঠের মধ্যে সব বাড়িঘর দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে জ্যোৎস্নায় যা কিছু একই রকমের মনে হয়, সোনালী কি যথার্থই চিনতে পারছে না ? 'সোনালী নিবাস' বাড়িটা কোন্ দিকে ? আকাশ এবং নক্ষত্রমালা দেখে নিখিল বুঝতে পারছে, তারা কিছুটা পশ্চিম দিকে হেঁটে যাচ্ছে। সোনালী পাশাপাশি হাঁটছিল। ভারি নিশ্চিন্ত। হাতে সেই এটাচি, কাঁধে জলের ফ্লাস্ক। একবার সে জিজ্ঞেস করবে ভাবল, সোনালী,

তোমার এটাচিটা আমি দেখব। ওতে আরও ঘুমের বড়ি রয়েছে কিনা আমার জানার দরকার। কিন্তু সোনালী হেঁটেই যাচ্ছে। একটা পাকা রাস্তা পার হয়ে গেল, পাশ দিয়ে আবার একটা পাকা রাস্তা ডান দিকে মোড় নিয়েছে।

নিখিল বলল, কোন্ বাড়িটা তোমাদের ?

—চিনতে পারছি না।

—বাড়িগুলো তো খালি।

—শেষ হয়নি। হলে ঠিক লোকজন চলে আসবে।

—কিন্তু এভাবে তুমি ·

—আসুন না দেখি। গ্যারেজটা দেখলেই চিনতে পারব।

নিখিল এবার ভীষণ বিরক্ত হল। বলল, অনেক রাত হয়েছে সোনালী, দেরি করে মেসে ফিরলে না খেয়ে থাকতে হবে।

—একদিন না খেলে কিছু হয় না।

এ-মেয়ে এখন অনেক কিছু বলতে পারে। এ-মেয়ে ভীষণ বেপরোয়া। এ-মেয়ে গতকাল আত্মহত্যা করার জন্য বাসে বিলাস ভ্রমণে বের হয়েছিল। জীবনের শেষ বিলাস-ভ্রমণ। এ-মেয়ে গতকাল একরকম, আজ অন্য রকম। সে ভেবে পেল না, মেয়েরা কেন এ-রকমের হয়।

সোনালী লম্বা ঝাউয়ের বনটাও পার হয়ে গেল। সামনে মসৃণ ঘাসের একটা ছোট্ট মাঠ। সোনালী বসে পড়ল।

—কী হল !

বাড়িটা হারিয়ে ফেলেছি। সকাল না হলে ঠিক চিনতে পারব না।

—সারাটা রাত তবে কী হবে ?

—কী হবে আবার। মাঠে শুয়ে থাকব।

—সোনালী, তুমি পাগল !

—পাগল না হলে এমন হয় ! কেউ ভালবেসে মা হয় ? আমি কুমারী মেয়ে ! কুমারী মেয়েরা মা হলে কী হয় জানেন না ?

নিখিল আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। কাল সকাল থেকে চলছে। বাসে সোনালী ওর পাশেই ছিল—ফ্লাস্ক থেকে জল নিয়ে একটা

ছুটো···তারপর আবার বাসটা দ্রুতবেগে বের হয়ে যাচ্ছে। রায়গঞ্জের বাস। নিখিল যাচ্ছে কাজে। পাশে এমন সুন্দরী তরুণী, মনে হয়েছিল নিখিলের এই সুদূর যাত্রায় পাশে সোনালীকে পেয়ে বেশ ভালই কাটবে।

সোনালী বলল, দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন? বসুন না।

নিখিলের মনে হল, গলাটা কেমন খুস খুস করছে। সে অনেকক্ষণ হল সিগারেট খেতে ভুলে গেছে। সে সিগারেট বার করল। লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, তুমি নিজের বাড়ি চিনতে পারছ না, আমি বিশ্বাস করি না।

সোনালী বলল, কাল সকালেও তো আপনি আমাকে চিনতেন না?

—না।

—কাল সকালে যখন দেখলেন লম্বা মতো ভারি আশ্চর্য মেয়েটি রায়গঞ্জ বাসের যাত্রী, আপনি কি ঘুণাক্ষরে ভাবতে পেরেছিলেন, যুবতী বাড়ি থেকে পালিয়ে, আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে?

—না, ভাবতে পারিনি।

—তবে এটা বিশ্বাস করতে কেন কষ্ট হচ্ছে বলুন। আমি বাড়িটা সত্যি চিনতে পারছি না। কেন বিশ্বাস করতে পারছেন না?

—এখন লোডশেডিং—অন্ধকারে সব অস্পষ্ট। আলো জ্বললে বোধ বোধ হয় চিনতে পারবে।

—তবে আলোটা জ্বলতে দিন। তারপর না হয় আর একবার দেখব চেষ্টা করে।

—কিন্তু এখানে কেউ এসে এ ভাবে দেখলে কি ভাববে বল ত।

—আপনি ত এখানটায় প্রথম এসেছেন। আমি এখানকার মেয়ে। এতটা রাস্তা এলেন, কাউকে দেখতে পেলেন?

—না। সত্যি অবাক লাগছে।

নিখিলও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সোনালীর কাছ থেকে একটু দূরেই কেমন অন্যমনস্ক মানুষের মতো বসে পড়ল। সোনালী ঘাসের মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে।

সোনালী পাশ ফিরে বলল, অত দূরে কেন? কাছে এসে বসুন। আমার মাথার কাছে।

নিখিল বলল, আলো জ্বলুক।

সোনালী হেসে ফেলল, আপনি ভারি ভীতু স্বভাবের। নিরুপম কিন্তু এমন ছিল না।

—নিরুপম?

—আমার বাচ্চাটার বাবা।

নিখিল দেখল, সোনালী তার পায়ের কাছে উঠে এসেছে। বলছে, আপনাকে আমি সিডিউস করব না। নিরুপমের কোন দোষ নেই। সব দোষ আমার। সব কিছুর জন্য আমিই দায়ী। সারা ট্রেনে একজন নির্ভর করার মতো মানুষ পাবার পর নিরুপমের উপর তার কেন জানি আর কোন রাগ নেই।

নিখিল কোন কথা বলল না। গতকালই সে টের পেয়েছিল সব। মেয়েটিকে সে বাথরুমে নিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো সব ধুয়ে দিয়েছে, শাড়ি সায়া পরিয়ে দিয়েছে প্রায়, কারণ সোনালীর তখন দাঁড়াবার পর্যন্ত ক্ষমতা ছিল না, টলে টলে পড়ে যাচ্ছিল, এবং সে বুঝেছিল, এই মেয়ের শরীরে ঈশ্বর সব লাবণ্য ঢেলে দিয়েছেন, যে কেউ মেয়েটিকে ছুঁলেই নিজেকে পবিত্র পবিত্র ভাববে।

সোনালী পায়ের কাছে কাত হয়ে শুয়ে আছে। যেন নিখিলকে এখন মানুষের সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন, নানারকমের প্রশ্নে জেরবার করে তুলবে। সে বলল, নিখিলবাবু, আপনার বাবাকে দেখে পুণ্যবান মানুষ মনে হয়। আচ্ছা যৌবনে পুণ্যবান এই মানুষটি কি কোন পাপ কাজ করেননি?

নিখিল বলল, আমি এটা কখনও ভেবে দেখিনি।

সোনালী শেষমেষ যেন নিখিলকে বাজিয়ে নিতে চায়। ভালবাসা-বাসি নিয়ে সে বড় বেশী সংশয়ে পড়ে গেছে। সে বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না। পুজোর ঘরে আপনার বাবার সেই গুরু-গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ, লম্বা দাড়ি, গলায় উপবীত, গেরুয়া রং-এর কাপড় এবং

উত্তরীয়, সব মিলে কেমন রামকৃষ্ণদেব রামকৃষ্ণদেব লাগছিল। আপনি সেই মানুষের ছেলে। আপনার বোনেদের আমার ভারি ভাল লেগেছে। আপনার মাকেও। আশ্চর্য অন্য এক ট্র্যাডিশন। আমি তো সেই ট্র্যাডিশনের কথা জানতাম না।

নিখিল বলল, হঠাৎ আমার বাবাকে নিয়ে পড়লে কেন?

সোনালী বলল, আপনার মাকেও নিয়ে পড়তে পারি। মা'র সম্পর্কে কেউ কিছু খারাপ কথা ভাবলে ছেলেরা রাগ করে।

আমি সে জন্য মা'র কথায় গেলাম না। মা'দেরও এমন হয় জানি। বালিকা যখন তরুণী হয়ে যায় চারপাশে শুধু দেখতে পায় নীল লাল রঙের বেলুন উড়ছে। শরীরে যে কী হয় তখন। ঘুম আসে না। ঘন ঘন পিপাসা পায়। এগার বার বছর থেকেই আমার এটা হয়েছে।

নিখিল শুনে যাচ্ছিল। সারা বাসে, বাড়িতে, ফিরতি ট্রেনে সে লক্ষ্য করেছিল, সোনালী যেন জীবনের সব কিছু হারিয়েছে। বেশী কথা বলেনি। যেটুকু বলার দরকার তাই বলেছে। বাড়ির কাছে এসে সোনালী এখন অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। সে কখনও প্রশ্ন করেনি, কি করে এমন হল। একবার সোনালীর বাবার কথা উঠেছিল। বাবার কথা উঠতেই হাউ হাউ করে কেঁদে দিয়েছিল, আমি বাবাকে মুখ দেখাব কি করে, আচ্ছা মরে যাওয়াটা কি খুব অন্যায়?

নিখিল বলেছিল, বারে অন্যায় নয়! বেঁচে থাকার মত পৃথিবীতে বড় কিছু নেই, জানো? এমনই দুটো একটা কথা হয়েছিল। গ্রামের লোকদের শেষ পর্যন্ত কি ধারণা হয়েছিল নিখিল এখনও জানে না। কিছু মানুষ থাকে মানুষের বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নিখিলকেও এমনই ভেবেছিল হয়ত। এবং সোনালীকে রিক্সায় করে যখন বাড়ির দিকে ফিরছিল তখন দু'জনই চুপচাপ। বাড়িতে গিয়ে কি পরিচয় দেবে? শেষ পর্যন্ত সুবন্ধুর বোন বলে চালিয়ে দিয়েছে। কারণ সোনালীকে একা ফের ছেড়ে দিতে কেন যেন নিখিলের সাহস হয়নি। না কি আসলে সেই রক্তে থাকে অন্তর্গত খেলা, সেই খেলার শিকার হয়ে গেছে নিখিল।

সোনালী বলল, আপনি কিছুই বলছেন না। আমিই কেবল বলব?

—আমি শুনছি।

সোনালী এবার উঠে বসল। মুখ গুঁজে দিল দু হাঁটুর ফাঁকে বলল, আপনি বাবাকে দোহাই কিছু বলবেন না।

—বলব না, কিন্তু তুমি একা সামলাতে পারবে?

—আপনি ত আছেন?

সোনালীর এই কথাটা নিখিলকে যেন কেমন দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলল। ট্রেনে সোনালীকে নিয়ে ফেরার সময়কার ঘটনা মনে পড়ছে। ট্রেন আসছে। সিগনাল ডাউন। অথচ স্টেশনে এসে সোনালী বলেছিল, চলুন ওয়েটিংরুমে বসব।

—বসার সময় নেই, ট্রেন এসে যাচ্ছে।

—আসুক।

—আমরা ট্রেন ফেল করব। সব ট্রেনই মানুষ ধরতে পারে না।

অথচ নিখিল দেখেছিল ট্রেন এলে ফাস্ট ক্লাসের কামরায় সোনালী লাফিয়ে উঠে গেল।

নিখিল বলেছিল, আরে করছ কি! থার্ডক্লাসের টিকিট। চেকার ধরবে।

—ধরুক। আপনি উঠুন তো।

নিখিলের মনে হয়েছিল, যে মেয়ে জীবন নিয়ে খেলা করতে পারে, সে সবই করতে পারে। অগত্যা নিখিলকে ফাস্টক্লাসেই উঠতে হয়েছিল। ফাঁকা কামরা। সেনালী পাশে বসে আছে। নিখিল বলেছিল, কাল সারাটা দিন আমার যে কি ভয়ে ভয়ে কেটেছে! যদি ফাঁস হয়ে পড়ত?

—পড়লে ভাল হত নিখিলবাবু। ওরা জানত আমি সত্যি ভাল মেয়ে নই।

আর এখন সোনালী বলছে, দোহাই বাবাকে কিছু বলবেন না।

নিখিল বলল, আমি কি বলব, এখন তো তুমিই সব সামলাবে।

—আমি কিন্তু নিরুপমের কথা বলব না।

—নিরুপমের কথা আসছে কেন?

—আমিই বাবাকে বলব।

—কী বলবে ?

—বলব—বলে জ্যোৎস্নায় নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

—বল কী বলবে ?

বলব ··কিন্তু কিছু না বলে আবার চুপ করে থাকল।

—কী হল ?

সোনালী আবার দু' হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে দিয়ে বলল, নিখিলবাবু, ফুলের কাঁটা আমায় বিঁধে ছিল। এতদিনে সেটা ফুল হয়ে গেছে।

—নিরুপমের ঠিকানা আমায় দেবে ?

—গেলে কিছু হবে না। ও জানিয়েছে সে ওর বাবা নয়।

—আর একবার চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ?

সোনালী সহসা কেমন আগুনের মতো জ্বলে উঠল।—সে দায়িত্ব আপনি নেবেন কেন ? ওটা তো আমিই পারি।

নিখিল ভারি বিব্রত বোধ করতে থাকল। ট্রেনে ফেরার পথেও নিখিল টের পেয়েছিল সোনালীর মধ্যে সেই ভ্রূণের দায় ভয়ংকর এক অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে। নিরিবিলি ট্রেনে সোনালী ভেবেছিল জীবনের সব কিছু খুলে বলবে। কিন্তু একজন যুবতীর পক্ষে তা কত কঠিন, সোনালীর চুপচাপ বসে থাকা না দেখলে টের পাওয়া যেত না।

সোনালীর অসহায় মুখ দেখে নিখিল বলেছিল, তুমি আমাকে সব বলতে পার।

সোনালী মুখ না তুলেই বলেছিল, মানুষ মরে যেতে চায় কেন নিখিলবাবু।

নিখিল বলেছিল, সোনালী, সব জানি, সব বুঝি। তুমি যে জন্য ভাবছ, ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

—আপনি জানেন! সোনালীর মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছিল।

—তোমাকে ভাল করে দেখলেই টের পাওয়া যায়।

ওরা দুজনেই পাশাপাশি বসেছিল। সারা শরীর থেকে আশ্চর্য সুঘ্রাণ

উঠছে মেয়ের। সব কিছুই তার ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। সে সোনালীর হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। বলেছিল, তুমি ভারি পবিত্র, সোনালী, তোমার সব কিছু আমার কাছে অত্যন্ত পবিত্র। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার।

নিখিলের সব মনে পড়ছে। এবং সে জানে সোনালীর যা কিছু জোর জুলুম এখন সেই কথার বিশ্বাসে। সে বাড়ির বড় অনুগত ছেলে। সোনালীদের জীবন যাপন সে জানে না। আবেগে যে সত্য সহসা উপলব্ধি করেছিল, এই মুহূর্তে তাকে তা কেমন ক্ষত-বিক্ষত করছে। সে বলল, সোনালী যাই কব, মাথা ঠাণ্ডা করে করতে হবে। আমার মা বাবা আছেন। সমাজ, আত্মীয় স্বজন, সব আছে।

সোনালী হা-হা করে হেসে উঠল, নিখিলবাবু, আমি জানতাম।

—সোনালী, তুমি কি চাইছ, আমি সত্যি বুঝতে পারছি না।

—এত সোজা জিনিসটা বুঝতে পারছেন না!

—না।

সোনালী এবার চুপ মেরে গেল। বলল, উঠুন। মনোজ আপনাকে দিয়ে আসবে। গ্রীন বেল্টের ওপাশটাতেই আমাদের বাড়ি। ঘড়িতে বেশী বাজে নি। রাত বারোটাও নয়।

কিন্তু নিখিল উঠল না। সে বলল, তুমি যাও আমি এখানে থাকব। কাল সকালে চলে যাব। আমার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না।

সোনালী বলল, আপনাকে একা ফেলে যাই কি করে! আপনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বেন। নিঃসঙ্গতার মতো বড় কষ্ট মানুষের নেই।

—আমার কখনও এটা মনে হয়নি। সব সময় মা বাবার জন্য, ভাই বোনদের জন্য বড় টান বোধ করি। তারপর গাছপালা মাঠ, মা'র পূজা-পার্বণ, বাবার সরল বিশ্বাস—জীবন সম্পর্কে ভারি টান বোধ করি সোনালী।

—আমার কেন যে একটা ভাই থাকল না? একটা বোন! আমরা কেন যে সব হারিয়ে ফেললাম!

নিখিল বুঝতে পারল না, এ সব বলে সোনালী কি বোঝাতে চাইছে
ঃপ করে থাকল।

সোনালী সহসা প্রশ্ন করল, স্ট্র্যাভিনস্কির কানটাটার নাম শুনেছেন ?

নিখিল বলল, না।

সোনালী বলল, পশ্চিম জার্মানিতে উপারটাল বলে একটা ছোট
র আছে।

—নাম শুনিনি।

—বাবা মাঝে মাঝেই বিদেশ যাবার সুযোগ পান। কখনও একা.
নও মা বাবা, কখনও আমরা তিনজনেই ঘুরেছি। শহরটা আমার
। লেগেছিল। জানি না কেন যে শহরটাকে এখনও ভুলতে
রি না।

নিখিল বুঝেছিল, সোনালীদের ঘরানায় পশ্চিমী হাওয়া ঢুকে গেছে।
নালী জীবন-যাপনে দেশের চেয়ে বিদেশের বেশী খবর রাখে।
এর কিছুই রাখে না। ইকনমিক্‌সে অনার্স নিয়ে বি এ পাস একজন
রণ যুবকের পক্ষে খুব বেশী জানা সম্ভব নয়।

সোনালী বলল, 'উইণ্ড ফ্রম দি ওয়েস্ট' আমি বাবার সঙ্গে সেখানেই
ম দেখি। স্ট্র্যাভিনস্কির কানটাটা নিয়ে এই নাচ তৈরি হয়েছে।
র বিষাদ। মগ্ন বিষাদের এমন গায়ে কাঁটা দেওয়া নাচ জীবনে আমি
তে পারব না নিখিলবাবু। বলেই সোনালী বড় করে একটা নিঃশ্বাস
। তারপর উঠে সোজা চলে গেল গ্রীন বেল্টের অন্ধকারে। ঝাউ
র মধ্যে কোন বনদেবীর মতো।

—কে ?

—আমি। দরজা খুলে দিল নকুল, তারপর সরে গেল। বাবা এসে
নে দাড়ালেন।

—এত রাতে। কার সঙ্গে এলে ? সলিল বলল।

—নিখিল এল না। মাঠে বসে আছে। নিখিলের সঙ্গে এসেছি।

সোনালী দেখল, বাবা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে আছে। নকুল

জেগে। বাবা যতক্ষণ টেবিলে থাকবেন নকুলের কোথাও যাবার নি
নেই। কখন কি দরকার পড়বে। বরফ, বোতল, কাচের গ্লাস, সব স
চাদরে সাজানো। ছুটির দিনে আমন্ত্রিত কেউ কেউ আসে। আ
আসত সুপ্রিয়কাকা। সে অবশ্য আংকল বলত। এখন মা আংক
সঙ্গে থাকে।

সোনালী বলল, রানাঘাটে যাইনি। বাসে নিখিলের সঙ্গে দে
ও জোরজার করে ওদের বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল।

এ-বাড়িতে নিখিল কে, কোথায় আলাপ, এ-সব প্রশ্ন করার বা
নেই কারো। তিনি বললেন, ভারি খারাপ ছেলে তো!

—খুব বাজে। বললাম চল। কিছুতেই আসবে না।

—ফিরবে কি করে! ফিরতে হবে ত! কোথায় থাকে?

সোনালী ওর ঠিকানা জানে না। দু'দিনে একবারও কলকা
ঠিকানা জানার ইচ্ছে সোনালীর হয়নি। কি ভেবে বলল, বালি
থাকে।

সে ত প্রায় হামবুর্গের কাছাকাছি! বলে সলিল কাচের গ্লা
হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সোনালীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ক
কোন্ মাঠ?

গ্রীন বেল্টের ও পাশের মাঠটায়, সোনালী বলল।

—নকুল টর্চটা দে। সাপ-খোপের উৎপাত আছে জানে না?

—কিছু বলিনি!

—বাঃ, বেশ হয়েছ তোমরা! তোমাদের আজকাল ছেলেমেয়ের
কি ভাব বুঝিনা। ওকে একা ফেলে আসতে বাধল না?

সোনালী বলল, না এলে কি করব। তোমার সঙ্গে আলাপ (
ও বড্ড সেকেলে। বাড়িতে দেখলাম, সেই ওল্ড ট্রাডিশন।

সলিল এখন আর কোন কথাই শুনতে চাইল না। মর্যাদার প্রশ্ন
সে গেট পার হতেই দেখল সোনালী এবং নকুল পিছু
আসছে।

সলিল নকুলকে বলল, তুই আবার কেন?

—জী সাব। বলে নকুল আর গেট থেকে নড়ল না।

ছোট মেমসাব বড় সাবের সঙ্গে চলে গেল। জ্যোৎস্নায় সে বাড়িটাতে ন একা। কত রাত হবে কে জানে আজ! আউট হাউসের দিকে ল, গভীর অন্ধকার। ঝাউ-এর বন থেকে অন্ধকারটা এগিয়ে সছে। যত জ্যোৎস্না সরে যেতে থাকে তত ঝাউ-এর ছায়া লম্বা যায়।

নিখিল মাঠে তেমনি শুয়ে আছে। সোনালী তার সঙ্গে এমন বহার করবে সে ভাবতে পারেনি। আসলে ওর মনে হল, এই সব যদের কিছুর প্রতিই বিশ্বাস নেই। সোনালী এত জানে, অথচ এটুকু ন না কেন, কেন বোঝেনি, একটু সাবধান হলে কী ক্ষতি ছিল। র তখনই মনে হল গ্রীন বেল্ট ক্রস করে কেউ এদিকে আসছে। ঝ মাঝে টর্চ জ্বেলে দেখছে। তারপর কি হবে, কি হবে, ভাবতে কল নিখিল। তার ভিতরে ভিতরে ভয়ংকর আতংক দেখা দিল। উঠে দাঁড়াল, কিন্তু কোন্ দিকে পালাতে হবে—ওদিকটায় মনে হচ্ছে কাটা তারের বেড়া।··সে ভাবি বিভ্রমের মধ্যে ড় গেল।

তারপরই মনে হল, সোনালীর গলা, নিখিল, নিখিল!

নিখিল বুঝতে পারল না জবাব দেবে কি না। দূর থেকে সে এখনও র কাছে অস্পষ্ট।

সোনালী আবার ডাকল, নিখিল, নিখিল! তুমি কোথায়?

নিখিল বুঝতে পারল, সে আর নিখিলবাবু নেই। সোনালীর আর জন বন্ধুর মতো নিখিল হয়ে গেছে। এমন কোন বিদঘুটে ঘটনা কোন ষের জীবনে কখনও ঘটে, সে বিশ্বাস করতে পারে না, অথচ নালীই ডাকছে। সোনালীর গলা স্পষ্ট। যত দূরেই থাক, সোনালী জনারণ্যে মিশে যাক কিংবা কোন সুদূর অতীতের অন্ধকারে যদি য়ে গিয়েও ডাকে, সে বুঝতে পারবে সোনালী তাকে ডাকছে। আর ফিরে যেতে পারবে না। বুকের মধ্যে যে মানুষের কি ক! সোনালী ফিরে আসায় তার মনে হয়েছে, এ-মেয়ের জন্য

সে সত্যি অনেক দূর যেতে পারে। সে বলল, আমি এখ
সোনালী।

—বাবা এসেছেন। তুমি এস।

নিখিল কাছে গিয়ে একজন লম্বা মতো সুপুরুষ মানুষকে দেখ
পেল। গায়ে সাদা রঙের আলখাল্লার মতো পোশাক। বাঁ-হা
একটা কাচের গ্লাস। সামনে যেতেই সোজা মুখে টর্চ মেরে বলল, তু
তো ভারি বেয়াদব ছোকরা! একা এই মাঠে বসে আছ!

নিখিল মাথা নিচু করল। আলোটা চোখে লাগছে। সোনা
পাশ থেকে হা-হা করে হাসছে।—কেমন মজা! বাবার দিকে তাকি
বলল, নিখিল।

প্রৌঢ় মানুষটি টর্চটা বগলে পুরে সেই মাঠেই হাত বাড়িয়ে দিল।

সলিল বলল, মানুষকে অসম্মান করার তোমার কোন অধিকার নে
তুমি এ-মাঠে বসে থেকে আমায় অসম্মান করেছ। কোন ভদ্রলো
পক্ষে তা সম্ভব নয়, তার বান্ধবীর সঙ্গে এসে বাড়ি পর্যন্ত না যাও
আই অ্যাম টেরিবলি শকড্।

নিখিল বুঝতে পারছিল, সোনালীর বাবার কাছে রাত বারোটা
বেশী রাত নয়। হাতে কাচের গ্লাস এবং তাতে টলটল করছে কি
সারা শরীরে লিকারের গন্ধ। কথায় টান ধরেছে। সোনালী বা
এমন ছবি নিখিলের সামনে কত অসংকোচে টেনে এনেছে। (
জীবনে এটা কোন ব্যাপার নয়। নিখিল ক্রমেই এক অন্য জগ
পরিবৃত হয়ে যাচ্ছিল। সে একটা কথাও বলতে পারল না।

সোনালী বলল, টর্চটা আমাকে দাও বাবা।

এবার সোনালীই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি নি
এবং সোনালীর বাবা। তিনি অনেকক্ষণ পর মনে পড়ার মতো হা
গ্লাসটা মুখের কাছে নিয়ে সবটা খেয়ে ফেললেন। এবং নিখিল দে
বেশ তেজী পুরুষের মতো তিনি হাঁটছেন। আর অজস্র কথা বলছে
কথাগুলোর মধ্যে কোথাও কোন প্রশ্ন নেই। নিখিল কে, সোনা
সঙ্গে কোথায় আলাপ, এত রাতে কেন, সকাল করে আসতে কি অসু

ছিল, এ-সব একান্ত যেন অবান্তর কথা। নিখিল সম্পর্কেও মানুষটার কোন প্রশ্ন নেই।

গেটের দুপাশে লো লাইং শেড তার ভেতর থেকে আলো উপচে বের হচ্ছে। নেম প্লেট দেখল নিখিল—এস কে নাগ—কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার।

নিখিল দেখল, সোনালী লাফিয়ে লন পার হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির চারপাশের আলোগুলো জ্বেলে দিচ্ছে কেউ। নকুল সহদেব দুই সহোদর এ বাড়ির খিদমতগার। নকুল আউট হাউস থেকে ছুটে আসছে। সামনে বড় ঝুল বারান্দা। মেহগিনি কাঠের কারুকাজ করা শেডের নিচে মারবেলের বড় সাইজের ডুম। দু দিকে দুই রূপোর পরী একটা উটপাখির ডিম নিয়ে যেন উড়ে যেতে চাইছে। বাল্‌বের ফাঁকে অদৃশ্য সব লাল নীল আলো ঠিকরে বের হচ্ছে। আরবের শেখদেব বৈভবের কথা নিখিল কাগজে পড়েছে। বাড়টায় ঢুকে তার মনে হল আরব শেখদের মতো লোকটার এত রাতেও সৌখিনতার শেষ নেই। কোন অভিশপ্ত প্রাসাদের মতো এতক্ষণ ঘুমন্ত ছিল সব কিছু বুঝি। নিখিল ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে—আর এক এক করে দরজা খুলে যাচ্ছে। সোনালী বলল, এস।

সলিল বলল, তাহলে তোমরা যাও, বলে তিনি পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন।

নিখিলের গা-টা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। সোনালীর বাবা এখন পর্দার ওপাশে। মনে হল, মানুষটা এই মাত্র ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেন। সহদেব সিঁড়ির এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। হোটেলের মতো সাদা উর্দি গায়ে, পায়ে কেডস।

সোনালী বলল, দাঁড়ালেন কেন, আসুন।

নিখিল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সারা রাস্তায় বাসে কি ট্রেনে এমন কি বাড়িতে একবারও সোনালী তুমি বলেনি তাকে। যতক্ষণ ওর বাবা সামনে ছিল, তুমি তুমি করে গেছে। আপনি বললেই বোধ হয় বাবার মনে সংশয় দেখা দিত। এখন ফের আপনি বলায় নিখিল কিছুটা আশ্বস্ত হল।

নীল আলোতে সোনালীর ক্লান্ত ভাবটা বেশী ধরা পড়ছে। যেন সে এক্ষুণি বিছানা পেলে শুয়ে পড়বে। ওর শাড়ি কিছুটা অবিন্যস্ত। নীল আলোতে সোনালীর মুখ দেখতে দেখতে মনে হল, সে একটা ভারি জাঁতাকলে পড়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত সেটা কোথায় গড়াবে যখন জানা নেই—অগত্যা অনুসরণ করা ভাল।

সে অনুসরণ করতেই দেখল, বড় পাল্লার সুইং-ডোর ওদের দেখে কেউ যেন খুলে দিল। কিন্তু সিঁড়ির মুখে কেউ নেই। সিঁড়ি ভেঙ্গে সোনালী দোতলায উঠছে। দরজাটা ফের নিজ থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। বলল, আমরা বাবার এলাকা পার হয়ে এলাম। মা এখানে থাকেন না।

অত্যন্ত পারিবারিক কথা। নিখিলকে সোনালী ধর্মগুরু-টুরু বোধ হয ভেবে সব বলে যাচ্ছে। এমন মানুষের কাছে কিছুই কনসিল করার নেই। কারণ এ বাড়িতে ঢোকার মুখেই নিখিল বুঝতে পেরেছে বাড়ির সবাই হাফ-ইংরেজ। কিন্তু আশ্চর্য, সোনালী কাল থেকে ওর সঙ্গে যত কথা বলেছে, সব সুন্দর বাংলা বর্ণমালায়। সে গোপন কথাটি না ভেবে বাড়িতে ঢুকে কনসিল কথাটা ভাবল।

সিঁড়িব শেষে সে দেখল দু' দিকে দুটো পেল্লাই দরজা। বড় বড় হোটেলের মতো দরজাগুলি ভিতর থেকে বন্ধ। সে একটা দরজায় আঙ্গুল তুলে বলল, ওদিকটায় গ্র্যাণ্ড মা থাকেন। কাল আলাপ হবে।

তুমি যে বললে মনোজ আমাকে দিয়ে আসবে।

একদিন থাকুন না। আপনাদের বাড়িতে আমি একদিন ছিলাম মনে রাখবেন।

নিখিলের বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, সে তো আমার দয়ায়, নয় তো পুলিস কেস হত! জানাজানি হলে পুলিস সহজে ছেড়ে দিত না। কেন এই আত্মহত্যা ? একটা কলঙ্ক মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, সঙ্গে আর একটা কেলেঙ্কারি যোগ হত। তোমার বাবার মুখে ইতিমধ্যেই এক গালে চুন মাখিয়ে রেখেছ, পুলিসে ধরলে আর এক গালে কালি পড়ত। নিখিল আর কথা বলল না। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

সোনালী দরজা খুলতেই সে দেখল বিশাল ড্রইংরুম। কোণায়

টেলিভিশন সেট। সারা ঘর জুড়ে হলুদ রঙের কার্পেট। আবছা অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার ছায়া ছায়া গাঢ় গভীর এক আলো আঁধারে নিখিলেব কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সে বলল, এত লো ভোলটেজ। ব্যাপার কি।

আপনার ভাল লাগছে না! বলে সোনালী একটা সুইচ টিপে দিতেই, ঝাড় লণ্ঠন নিভে গিয়ে দুটো বড় চাঁদের মতো থালা দু' দেয়ালে জ্বলে উঠল। একেবারে দিনের আলো যেন ঘরটায় ছড়িয়ে পড়েছে। নিখিল কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে এখন। সে আব যথার্থই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। স্যুটকেসটা পাশে বেখে সে সোফায় শরীর এলিয়ে দিতেই কেউ মনে হল দরজা দিয়ে ঢুকছে। একজন প্রৌঢ় লোক। বেঁটে খাটো, আবলুস কাঠের মতো রঙ, চোখ দুটো অতিশয় ছোট, লুঙ্গি এবং লম্বা পাঞ্জাবি গায়। হাতে বড় ট্রে, দু গ্লাস ঠাণ্ডা পানীয়। সে এল, টেবিলে রেখে চলে গেল। সোনালী ভিতরেব দিকে দরজা ঠেলে তখন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেবল নিখিল একা। দেয়ালে সব অয়েল-পেন্টিং। কোন কোন মুখ যেন তার চেনা। সেই পরিচিত ভ্যান গগের ছবিটা দেখে বুঝতে পারল, সোনালীর ছবির প্রতি একটা আকর্ষণ আছে।

সোনালী আবার দরজা ঠেলে বের হয়ে এল। বলল, চান করে নিন, তারপর সোনালী সেই ঠাণ্ডা পানীয়টি হাতে তুলে চুমুক দিল। বলল, আমার দিকে এত কি দেখছেন!

—এত রাতে চান! সহ্য হবে না।

—করে দেখুন না। সহ্য হয় কিনা দেখুন!

—হাত মুখ ধুয়ে নিলে হয় না।

—সারাটা রাস্তা এলেন! ঘামে জবজবে, এখন একটু ঠাণ্ডা হতে ক্ষতি কি। তারপর বলল, কোল্ড ড্রিংকস, খান।

—খাব বলছ?

—ক্ষতি হবে না খেলে।

নিখিল হাত দিয়ে দেখল বরফের মত ঠাণ্ডা। সে এত ঠাণ্ডা কোনদিন খায় না। সে বলল, গলা বসে যাবে।

—বসবে না। খান। সব তাতেই ভয়।

বলতে ইচ্ছে হল, সোনালী, এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে! সরকারী অফিসের সামান্য একজন জুনিয়র অফিসারের তো এত অভিজ্ঞতা নেই।

সোনালী দেরি দেখে বলল, খান, বসে থাকলেন কেন? তাড়াতাড়ি করুন।

আবার একটা ট্রে এল। ভাঁজ করা দুটো তোয়ালে, পাজামা, পাঞ্জাবি পাট করা।

নিখিল দেখে বলল, সবই আছে। ওটা নিয়ে যেতে বল সোনালী। আমাকে এত গরিব ভাবছ কেন?

কিন্তু সেই আবলুস কাঠের মতো রঙ লোকটা দাঁড়াচ্ছে না। বের হয়ে যাচ্ছে। সোনালীর সঙ্গে কোন কথাও হচ্ছে না। অথচ একের পর এক সব চলে আসছে কি-ভাবে সে বুঝতে পারছে না। তবে কি এই যে ক্ষণিকের জন্য ভিতরের দরজা দিয়ে সোনালী মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেছিল, তখনই সব কিছু বলে এসেছে। তার কেমন কৌতূহল হল। সে বলল, তুমি ওদিকে কোথায় গেছিলে?

—স্টুডিওতে।

—বল কি! এ বাড়িতে স্টুডিও?

—আসুন না দেখবেন।

নিখিলের উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তবু রহস্যটা জানার জন্য বলল, চল তো দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে দুজনই উঠে গেল। এবং ভিতরে গিয়ে নিখিল হাঁ। সত্যি কোন বড় চিত্রকরের স্টুডিও যেন। রঙ, আর্ট পেপার, ক্যানভাসের ছড়া-ছড়ি। তাকে বই ঠাসা। সোনার জলে নাম লেখা সব ছবি-সম্পর্কিত বই। সারাটা ঘর জুড়ে কোথাও ফ্রেমের কাঠ, পিচ বোর্ড, কাচ। কোথাও কিছু ছবি ডাঁই করা। গোটা-ত্রিশেক ছবি দেয়ালে, ইজেল কোনটা লম্বা, কোনটা বেঁটে। একটা ছবির সামনে এসে সে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, বেগুনী সবুজ আর হলুদে

আঁকা বিশাল এক রাস্তায় একজন উলঙ্গ পুরুষ নির্বিকারে হেঁটে সামনে চলে যাচ্ছেন। পাইনের হলুদ নীল ছায়া কোন দূরবর্তী মাঠের মতো দিগন্তে ভেসে রয়েছে। ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে নিখিল মানুষেব এক অবিনশ্বর যাত্রার প্রতিবিম্ব স্মরণ করে তাকিয়ে থাকল। তার মনেই থাকল না, এ-ঘরে অন্য কেউ আছে।

সোনালী বলল, সকালে দেখবেন নিখিলবাবু। আমাদের খাবাব দেওয়া হয়ে গেছে।

নিখিল চুপচাপ বের হয়ে গেল। এ-দেখা মানুষেব এক দণ্ডেব নয়। এ-দেখা মানুষেব অনেকদিন ধরে চলছে। সে ড্রইংরুমে ঢুকে সেই পাঞ্জাবি এবং পাজামা তুলে নিল।

সোনালী পাশেব একটি দরজা খুলে বলল, সব আছে ভিতবে।

নিখিল বলল, তুমি আগে কবে নাও। কাল আজ দুটো দিন এক নাগাড়ে—

আমি পাশেরটায় যাচ্ছি। আপনার হবার আগেই আমার হয়ে যাবে।

দরজা বন্ধ করার সময় মনে হল, এই এস কে নাগ পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য এনে হাজির করেছেন নিজের এই বিশাল স্থাপত্য ভূমিতে। কেবল একটা জায়গায় তিনি হেরে গেছেন। সোনালীর মা এখানে থাকেন না। কোথায় থাকেন? সেই কি যেন একটা নাচের কথা বলেছিল সোনালী, যেখানে নিসঙ্গতা হাহাকার করছে—প্রেম এবং সান্নিধ্য একমাত্র যা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। সোনালীর জন্য সে কেমন এ-সময় অপার করুণা বোধ করল।

নিখিল বের হয়ে দেখল, সোনালী একটা নীলাভ সিল্কের ম্যাকসি পরে দাঁড়িয়ে আছে ওব জন্য। চুল বব করা এবং সারা শরীরে পারফিউমের গন্ধ। মুখে কোন প্রসাধন নেই। কেবল চুলটা সামান্য আঁচড়ে নিয়েছে। তবু সে কেন জানি সোনালীব দিকে তাকাতে পারল না। আগুনের মতো জ্বলছে সোনালী। নিখিল ওর দিকে না তাকিয়েই বলল, আমার হয়ে গেছে। এখন কি করতে হবে বল।

—আসুন।

নিখিলের আবার শুধু অনুসরণ। পিছু পিছু যাওয়া। আবার হলঘর। মাঝখানে শ্বেত পাথরের লম্বা টেবিল।

কেউ নেই। যেন কোন ইন্দ্রজালে সব খাবার তৈরী। সাদা বড় চিনেমাটিব প্লেট। চিনেমাটির কারুকাজ করা পট। কাচের জারে টলটলে ঠাণ্ডা জল। ঢাকনা তুলে সোনালী দেখল—সব কিছু থেকেই গরম ভাপ উঠছে। সোনালী বলল, বসুন।

সোনালী চিনেমাটির বাটিতে ডাল দিল। বেগুন ভাজা এবং ফিস-ফ্রাই। তারপর বলল, ফিস-ফ্রাইটা তুলে রাখুন। ফ্রাইড রাইস আছে।

—ও আমি খাব না।

—চিলি চিকেন, ভাল লাগবে, খান।

নিখিল বলল, আমার অত অভ্যাস নেই। মাছ ভাত হলে কিছু আর লাগে না।

সে নিখিলকে প্লেটে করে ভেটকি মাছের সঙ্গে টমেটোর জুস দিয়ে রান্না ঝোল দিল।

নিখিল বলল. তুমি নাও।

—আমি ভাত খাই না।

—কি খাবে? আমাদের বাড়িতে তো খেয়েছ।

রাতে এক পিস রুটি, একটু চিলি চিকেন, এক চামচ ফ্রাইড রাইস।

এত রাতে এমন আয়োজন, যেন পূর্ব নির্ধারিত কোন আমন্ত্রণ লিপির পর ভোজন পর্বের কাজ শুরু হয়েছে। নিখিল ছাপোষা মানুষ, মানুষের জন্য বাড়িতে সব সময় এমন বাড়তি আয়োজন থাকে সে কখনও কল্পনা করতে পারে না। সে বলল, তুমি কি যাদু জান?

—ও কথা কেন?

—যাদু না জানলে এটা হয় না।

সোনালী হাসল।

—তোমাদের বাড়িতে কি আলাদিনের প্রদীপ আছে ?

সোনালী বলল, থাকলে, নিরুপমকে এ-বাড়ির দারোয়ান করে রাখতাম।

—নিরুপমকে দারোয়ন রাখলে স্বস্তি পেতে ?

—স্বস্তি পেতাম কিনা জানি না, তবে মনে শান্তি পেতাম।

নিখিল দেখল, সোনালী নিরুপমের কথা বলতে গিয়ে কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

নিখিল হাত দিয়েই খাচ্ছে। পাশে বাখা কাঁটা চামচ সে ব্যবহার করছে না। সোনালী কাঁটা চামচে কেটে কেটে এক আধ টুকরো মুখে দিচ্ছে, আর নিখিলের দিকে তাকিয়ে ওর খাওয়া দেখছে। স্বাভাবিকতায় মানুষের কোথায় যেন মুক্তি আছে। নিখিলের খাওয়া দেখতে দেখতে সোনালীর এমন মনে হল। তারপরই কেমন আবেগে সোনালী বলে ফেলল, নিখিলবাবু আপনি আমাকে বাঁচান !

নিখিল কি বলবে ভেবে পেল না। এমন আর্ত গলা কোন নারীব হতে পারে সে যেন জানত না। সে চুপ করে থাকল।

—আমি আপনার সব কথা শুনব।

নিখিল কী বলবে এখনও বুঝতে পারছে না। সোনালী গর্ভে ভ্রূণ ধাবণ করে আছে। সে তাকে নিয়ে বাঁচতে চায়।

সোনালী এখন খাচ্ছে না। নিখিলেব দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। সোনালী জানেই না, নিখিল এ-বাড়িতে ঢুকেই সোনালীর নিসঙ্গতার রুদ্ররূপটা টের পেয়েছে। এবং স্নানেব পবে সোনালীর এই একাকীত্বের জন্য তার কেন জানি দারুণ কান্না পাচ্ছিল।

নিখিল বলল, তুমি খাও।

আমি কিছুই আর আজ থেকে খাব না।

—ছেলেমানুষী কর না।

সোনালী কাঁটা চামচ রেখে বসে থাকল।

নিখিল বলল, তুমি খাও সোনালী। আমাকে একটু ভেবে দেখতে দাও।

সোনালী কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বলল, আমি জানি আপনি কি চান। আপনি আমাকে নিরাময় করে তুলতে চান। কিন্তু আপনি জানেন, এমন নিরাময়ে আমার বিশ্বাস নেই।

—এটা হয় না সোনালী। ডাক্তারদের সঙ্গে আমার পরামর্শ করতেই হবে।

—না না। দোহাই করবেন না। যে আমার নাড়ীতে লেপ্টে আছে, আমার রক্তে জড়িয়ে আছে, তাকে আমি বিনাশ করতে দেব না। কিছুতেই না। এক প্রচণ্ড হাহাকারের মধ্যে সোনালী কথাগুলি বলল। তারপর হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকল—শিশুর সান্নিধ্য ভালবাসা পেলে আমার সব একাকীত্ব মুছে যাবে নিখিলবাবু।

নিখিল বিস্ময়ে হতবাক! ও বলছে কি! তবে ও মরতে গেছিল কেন! তাহলে কি যে ভ্রূণটা বাড়ে দিনে দিনে, তাকে নিয়ে হয় বাঁচবে নয় মরবে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে সোনালী বের হয়ে ছিল! সে সব ভেবে এত হতবাক যে কিছু বলতে পারল না। চুপচাপ খেয়ে যেতে থাকল। ঠিক খাওয়া নয়, যেন কিছু করতে হয়, কারণ এমন সময়ে তার জানা নেই, নারীর সঙ্গে কি কথা বলতে হয়। ভেতরে রয়েছে সেই এক অপার দুঃখবোধ—সে সোনালীকে নিয়ে এ-ভাবে কতদূর যেতে পারবে, সে ঠিক কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

সহসা সোনালীই বলল, উঠুন। তারপর ওর বসার ঘরে নিয়ে গেল। বলল, আমার জন্য ভাববেন না। আসুন একটা রেকর্ড শুনি। আমার বড় প্রিয় গান। কিছু ভাল না লাগলেই গানটা বাজিয়ে শুনি। বার বার শুনি। বার বার। এই 'বার বার' কথার মধ্যেই একসময়ে গমগম করে মিউজিক বেজে উঠল সারা ঘর বাড়ি, আকাশ বাতাস, সামনের দিগন্ত ব্যাপ্ত কাশ ফুলের মাঠ সেই মিউজিকে এখন আশ্চর্য এক জগত—যেন জীবন থেমে থাকে না—সে নিরন্তর বয়ে চলে। গানটার সব নিখিল বুঝতে পারছে না—কেবল থেকে থেকে কানে আসছে—দেয়ার ইজ সামথিং ইন দ্য এয়ার দ্যাট নাইট। দি স্টারস ওয়ের সো ব্রাইট ফারনানডো। দে ওয়ের শাইনিং দেয়ার ফর ইউ অ্যাণ্ড মি।

সোনালী নিমগ্ন হয়ে আছে রেকর্ডের পাশে। আজানু তার গভীর
লাভ পোশাকে ঢাকা। বড় পবিত্র, বড় সুন্দর। নিখিলের ভারি
চ্ছে হচ্ছিল, এ সময় একটু সোনালীকে ছুঁয়ে দেখে।

নিখিল করিডোর ধরে আবার হেঁটে যাচ্ছে। আগে যাচ্ছে সোনালী।
-পাশের দেয়াল মোমের কাজ মসৃণ সাদা। পায়ের নিচে মেজেণ্টা
ঙের টাইলস। আশ্চর্য সব কলকা টাইলাস। এত মসৃণ যে মাঝে
াঝেই সে পা টিপে হাঁটছে। যেন অন্যমনস্ক হলেই পা স্লিপ করবে।
ষ্টির পর পিচ্ছিল রাস্তায় সাবধানী লোকেরা যে-ভাবে হাঁটে সে ঠিক
ই ভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। আবার বড় দরজা সামনে।
ানালী ফিরে তাকাচ্ছে না। কারণ সোনালী বুঝি বুঝতে পেরেছে,
ততটা রিস্ক নিতে রাজি না। একজন বন্ধুর মতো নিখিল এখন
ানালীর সঙ্গী মাত্র। কারণ মুখ দেখেই বুঝি টের পেয়েছে সোনালী,
াথাও তার একটা অস্বস্তির কাটা বিঁধে আছে। সেই থেকে সোনালী
ব সময় বাড়ির কথা বলেছে, ঠাকুমার কথা বলেছে, বাবার কথা বলেছে।
কর্ড-প্লেয়ারে দুটো একটা গান বাজিয়েই আবার অস্থির হয়ে পড়েছে
ারও কিছু বলার জন্য। নিখিলকে দুদিনে কতটা বিশ্বাস করা যায়
ও বোধ হয় মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

দরজা খুলে বলল, আসুন।

নিখিল দেখল, অন্ধকারের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে সোনালী। ভেতরের
ইচ টিপে আলো জ্বালছে না। সে ঢুকতে ইতস্ততঃ করছিল। সোনালী
র বলল, আসুন না। ভয় নেই। আলো জ্বাললে মজাটা নষ্ট
য় যাবে।

দরজার অভ্যন্তরে এখন সোনালী কোথায় টের পাওয়া যাচ্ছে না।
রিডোরের স্তিমিত আলোটাও নেই। তবে কি ফের লোডশেডিং! এত
বাড়িটা ভারি নিঃশব্দ। অন্ধকারের মধ্যেই ও-পাশের ব্যালকনির দরজা
উ খুলে দিচ্ছে। ঘরে সুঘ্রাণ। এই মাত্র কেউ কিছু যেন স্প্রে করে
য় গেছে। সোনালী আবার তার কোন্ পৃথিবীতে তাকে নিয়ে যাচ্ছে!

হাই উঠছিল। অবশ্য জানে রাতে সে আজ আর অস্বস্তিতে ঘুমাতে পারবে না। সোনালীর কোথায় যেন কিছুটা স্বেচ্ছাচারিতা আছে খেয়ালী। তবে সে কথাবার্তা বলে টের পেয়েছে, সংসারে সে আর একা বাঁচতে চায় না। যে এসে গেছে, যদি বাঁচে তাকে নিয়েই বাঁচবে একবার বলেছিল, ওর কি দোষ বলুন। কেন আমি ওকে ছুঁড়ে ফেলব তাহলে আমি পরে কোন্ সাহসে বেঁচে থাকব। আমি ত তবে একজন স্বেচ্ছাচারী মা।

বিষয়টি ভাবলে তাই। সোনালী এ কি রকম অগ্নি পরীক্ষায় ফেলে দিল! যেন বলছে সোনালী, ওহে নিখিলবাবু, তোমার এতই যদি ভালবাসা, তবে সবটা নিয়ে হবে না কেন। সে আর আমি ত এখন এক। যদি ভালবাস তবে তাকেও বাস। সে আমার থেকে আলাদা হবে কেন! অন্ধকারে এমনই ভাবছিল নিখিল, আসলে কিনারা করতে পারছে না, অথচ পায়ের শব্দে বুঝতে পারছে সোনালী তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, এবং হাত বাড়ালেই সে উঠে আসবে। এখন কেমন বালকের মতো ভীতু গলায় ডাকল, সোনালী, তুমি কোথায়!

সোনালী বলল, ভয় পাচ্ছেন?

—না।

—তবে এমন কাতর গলা কেন!

—জানি না।

সোনালী বলল, সেও অন্ধকারে আপনার মতো অসহায়।

—কার কথা বলছ।

—যে জরুলের মতো জরায়ুতে বাড়ছে।

নিখিলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এই মেয়ে গাড়িতে একরকম আশ্রমের মত তার বাড়িটাতে আর একরকম। একটার সঙ্গে আর একটা সে মেলাতে পারছে না। বলছে, গভীর অন্ধকারে সেই প্রাণ অতি সংগোপনে আত্মার সঙ্গে লেগে আছে। সহায় সম্বলহীন। অন্ধকারে সে যেমন নিজেকে সহসা অসহায় বোধ করছিল, এক অপরিচিত রহস্যময়তা নিয়ে তাকে ভয়ের কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছিল, সেও তেমনি

নিরন্তর কাঁটা বিদ্ধ হয়ে আছে। একজন ক্রুশবিদ্ধ পুরুষের ছবি সে সহসা অন্ধকারে ভেসে উঠতে দেখল। আসলে সে জানে না, ধীরে ধীরে ঘরের অন্ধকার সরে যাচ্ছে। কেউ যেন ঘরে অতি সঙ্গোপনে ধীরে স্তিমিত আলো জ্বেলে ক্রমে তা আরও উসকে দিচ্ছে। এবং দেয়ালে নিখিল দেখতে পেল সত্যি এক ক্রুশবিদ্ধ যুবক মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

সোনালী বলল, এ-ঘরটায় থাকবেন। ভয় নেই।

আলো জ্বলতেই সব পরিষ্কার। বিশাল হলঘরের এক পাশে একটা খাট সন্থ পালিশ করা মনে হয়। মেঝেয় দামী হলুদ রঙের কার্পেট পাতা। সেন্টার টেবিল, লম্বা হাতলওয়ালা দু-খানা চেয়ার। এক কোণায় মস্ত বিলিয়ার্ড টেবিল। কোণে রিঙের মধ্যে কিছু ছোট বড় বিলিয়ার্ড স্টিক। আর লাল নীল বল মসলিনের মত এক ময়লারে ঝোলানো। আর এক পাশে কি একটা পড়ে আছে। কিছুটা ঘোড়ার পিঠের মতো। সাদা সিল্কের পর্দা দিয়ে ঢাকা। ভিতরে কি আছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। সোনালী দরজা অতিক্রম করে ব্যালকনিতে ঝুঁকে কিছু দেখছে। সে স্থানুবৎ দাঁড়িয়েছিল। এত বড় ঘরে শোওয়ার অভ্যাস নেই। এখনও বাড়িতে গেলে তিন ভাই লম্বা চৌকিতে এক মশারির নিচে শোয়। ঠেলাঠেলি, এবং কেউ একজন না থাকলে বিছানাটা খালি লাগে। সে বলল, আমাকে এ-ঘরে শুতে বলছ?

ব্যালকনি থেকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, হুঁ।

—তুমি ওখানটায় কি দেখছ!

—কিছু না।

—আমি তালে শুয়ে পড়ব!

—শোবেন না ত কি করবেন! কেবল হাই তুলছেন কখন থেকে!

—তুমি কি ঘুমাও না!

—খুব কম।

—কেন?

—জানি না।

এই জানি না এমন শব্দ যে কখনও কখনও বড় কুহকের সৃষ্টি করে। মনে হয় সারারাত কেউ তার সঙ্গে দুষ্টুমী করতে চায়। যেমন শিশু হাতে খেলনা পেলে সহজে ছাড়তে চায় না, সোনালীর ক্ষেত্রেও বুঝি তাই হয়েছে। আসলে যে মরে যেতে চেয়েছিল, যখন মরতে পারেনি, অন্য এক পৃথিবীর সবুজ গাছপালার ভেতর সে এক আশ্চর্য সুঘ্রাণ পেয়ে খুব সাহসী হয়ে উঠেছে, অথবা সোনালী কি নিজের ভিতর যে প্রাণের আবেগ বোধ করে থাকে, আজ তা আবার অনেকদিন পর স্বাভাবিক হয়ে উঠছে! কিন্তু সব সময় কম কথা বলা, ধীর হেঁটে যাওয়া, নিজের শরীর সম্পর্কে উদাসীন থাকার মধ্যে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায় তৈরি করতে চাইছে। যেন ঘুমিয়ে পড়লেই দুজনের মনে হবে গত জন্মের কথা। এবং রাস্তায় দেখা কোন নারীর মতো সে আবার অদৃশ্য এক জগতের বাসিন্দা হয়ে যাবে। যেন কোথাও একটা ভয় থেকে গেছে সোনালীর। তাকে ঘুমাতে বলে, তার বিছানা ঠিক করে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে। তাকে কাছে যেতেও ডাকছে না। বড় সম্পর্কহীন মনে হচ্ছে তার নিজেকে।

সে বলল, আমি তালে শুয়ে পড়ছি সোনালী। যাবার সময় আলোটা নিবিয়ে দিও।

—দেব। এইটুকু বলে সোনালী কি ভাবল কে জানে। ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, জল থাকল। রাতে তেষ্টা পেলে খাবেন। পাশের ঘরে আছি। দরকার পড়লে ডাকবেন। বলে একটা দরজা খুলে সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। তার ঘরের দরজা বন্ধ করে গেল না। কোথায় অদৃশ্য সব সুইচ রেখে গেল নিখিল তার কিছুই জানে না। সে একবার ভাবল দরজার কাছে গিয়ে ডাকে, আলো এখানে ঠিক কি-ভাবে জ্বলে আমি জানি না। কোথায় সুইচ আছে তাও দেখছি না। কিন্তু সোনালী তার দরজা বন্ধ করে যে চলে গেল! তাকে আর খুঁজে পাবে কি করে! সে অবশ্য যে-দরজা দিয়ে ঢুকে গেছে সোনালী, সেখানে ঢুকে দেখতে পারে। কিন্তু শুনতে পাবে কেন। কারণ এই বিরাট বাড়িটায় কোন্‌দিকে কি-ভাবে লম্বা পথ গেছে তার হদিস সে জানে না। অথবা

এমনও হতে পারে অন্য একটা দরজা খুলে যাবে দেয়ালের। সেখানে সে দেখতে পাবে, সাদা গরদ পরে পবিত্র এক নারী তার ঘরে ঢুকছে। সে আলোর মধ্যেই খাটে শুয়ে পড়ল। তার কাছে এখন আলো অন্ধকার দুই সমান। ঘুমের বারটা বাজিয়ে দিয়ে সোনালী চতুর নারীর মতো সরে পড়ল।

এখন এই সুবৃহৎ হলঘরটা কেমন ফাঁকা শূন্যতায় ভরা। কোন শব্দ নেই। আলো জ্বালিয়ে ঘুমানোর অভ্যাস নেই তার। বিরক্তিতে ফের উঠে বসল। তারপর সে দেয়ালের পাস দিয়ে হেটে গেল। ডিমের মতো মসৃণ দেয়াল, সুইং ডোর সব। কোথাও গোপন ছিটকিনি লাগানো, টানাটানি করতেই বালকনির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কোথাও এখন ফাক ফোঁকর নেই। সে বুঝতে পারল আসলে সব ঘরই এয়ার কণ্ডিসান করা। দেয়ালের এক দিকে শেকলের মত কি বসান আছে। বিছানায় পাটভাঙ্গা চাদর, নরম বালিশ, খাটটা সাদা—একটা রাজহংসী যেন মেঝেতে ডিমে তা দেবে বলে বসে আছে। কিন্তু যা তাকে পাগল করে দিচ্ছিল, জানালা খোলা না থাকলে সে কেমন হাসফাস করে। জানালা আছে। তবে কাচে মোড়া। কিন্তু আশ্চর্য তার ঘাম হচ্ছে না। অবশ্য সময়টা হেমন্তের শেষাশেষি। রাতের দিকে ঠাণ্ডা এমনিতেই পড়ে, গায়ের কাছে সোনালী একটা অন্ততঃ চাদর রাখলে পারত। শীত মানুষের এক রকমের নয়। কেউ বেশী শীতকাতুরে কেউ কম। সোনালী জানবে কি করে, সে গায়ে কতটা শীত অনুভব করে থাকে। আর যাই হোক দুদিনের পরিচয়ে এতটা জানা সম্ভব নয়। তার কেমন সোনালীর ওপর রাগ হচ্ছিল। কিছুটা বিরক্ত। কখনও কখনও মনে হয়েছে, সোনালী চায়, সে অন্ধকারে তাকে হাতড়ে বেড়াক। এতে বোধ হয় নারীদের জন্য মানুষের রহস্য বেড়ে যায়! সোনালী কি অদৃশ্য কোন স্থান থেকে সব লক্ষ্য করছে। অথবা সোনলী কি চায়, ভয় পেয়ে সে কোন তামাসা সৃষ্টি করুক। অথবা সারারাত জাগিয়ে রেখে অন্য কোন মজা!

কিন্তু সোনালী ত জানে না, নিখিল নামক মানুষটির কিছুটা

একগুঁয়েমির স্বভাব আছে। এই স্বভাবের জন্যই যেখানে মনের দিক থেকে সায় থাকে না, তা যত লোভের হোক, সে পাত্তা দেয় না! সে অগত্যা যা হয় হোক ভেবে শুয়ে পড়বে ভাবল। আর ক'টা ঘণ্টা। ঘড়ি দেখে বুঝল রাত একটা কখন পার হয়ে গেছে। এ-পাশ ও-পাশ কবতে করতেই সকাল হয়ে যাবে। সে কিছুতেই আর অসহায় বোধ করবে না। যার এত দুর্ভোগ সামনে, সে কি করে যে সহসা এমন নির্মম হতে পারে ভেবেই পায় না। সোনালীর এটা নিষ্ঠুরতারই সামিল। হাত-ঘড়িটা খুলে পাশে রাখল। পাঞ্জাবি খুলে ফেলল। একটা গেঞ্জি গায়ে সাদা আলোর মধ্যে সে শুয়ে পড়ল। সমান্তরাল এক সাদা পাথরের উপত্যকার মতো এই সুবিশাল ঘর। ছাদের আকাশ যেন কতদূরে চলে গেছে! কোথায় বুঝি নক্ষত্র ফুটে উঠবে এবার। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে মনে করতে পারল এই কিছুক্ষণ আগেও ত তার মধ্যে একটা আশ্চর্য মিউজিক বাজছিল। রেকর্ডের সেই মিউজিক এবং গান—যেন সোনালী সেই নক্ষত্রের বুকে হেঁটে গিয়ে ডায়াসে দাঁড়াচ্ছে। সামনে মাইক। পেছনে ব্যাণ্ড-মাস্টার। সে গাইছে, লাভ মি অর লিভ মি মেক ইউর চয়েস / বাট বিলিভ মি আই লাভ য়ু / আই ডু / আই ডু তারপরই আবার শুনতে পায়, হানি হানি হাউ য়ু থ্রিল মি হানি, হানি। যেন কোন যুবতীর বিলাপের মতো শোনাচ্ছে। ডায়াসে সেই একা নারী—পিছনে একজন ব্যাণ্ড-মাস্টাব দাঁড়িয়ে। নিখিল যেন নিজেই সেই ব্যাণ্ড-মাস্টার। আর সামনে দর্শক আসনে যারা বসে আছে সবাই নিরুপম। এক মুখ। এক ইচ্ছা। তারপর সেই সব নানাবিধ চিন্তা ভাবনার মধ্যে একসময় আবার শুনতে পেল, অনেক দূব থেকে কোন কুলের উপত্যকা ধরে কেউ হেটে আসছে। পায়ের শব্দ। সেই সব বিষাদমগ্ন সংগীত প্রবল ঝড়ের মতো তাকে নাড়া দিচ্ছে—দেয়ার ওয়াজ সামথিং ইন দ্য এয়ার দ্যাট লাইট / দি স্টারস ওয়েয়ার ব্রাইট ফার্ণানডো / দে ওয়েয়ার সাইনিং দেয়ার ফর ইউ অ্যাণ্ড মি ফ্র / লিবার্টি ফার্ণানডো। পায়ের শব্দ কানের কাছে। যেন হাই করে বলছে, বড় হতে হতে আমরা কি চাই নিখিল। আমরা ভালবাসা চাই। ভালবাসা আমাদের মহৎ

করে দেয়। জননী হয়ে যাই। ভালবাসার উপত্যকায় হেঁটে না গেলে, কে কখন জননী হয়। নিরুপম আমার ভালবাসার মানুষ ছিল। জননী হবার মুহূর্ত পর্যন্ত সে আমার ভালবাসার মানুষ ছিল। তারপর কখন যে সে কিছু কাঁটাঝোপ বানিযে সরে পড়ল নিখিল! আমার কি দোষ বল!

নিখিল চোখ বুজে বলল, না না তোমার কি দোষ! তবু মানুষের জানতে হয়, সেই উপত্যকায় আমবা কেউ সে-ভাবে হেঁটে গেছি কি না। রাস্তাটা পার হবার আগে মোড়ের আলো দেখে বুঝতে হয় সিগন্যাল কি বলে! তুমি কিছু না মেনে চলতে চাইলে দুর্ঘটনা ঘটবে। কাউকে তুমি দায়ি করতে পার না সোনালী।

সেই এক নক্ষত্রলোক থেকে যেন তেমনি তার সঙ্গে সোনালী কথা বলে যাচ্ছে। আবার একাকীত্ব অনুভব করতে পার না কেন! এবং যেন নিখিল ততক্ষণে বুঝতে পারল, একাকীত্ব মানুষের পক্ষে কত মারাত্মক, এই হল ঘরটায় তাকে রেখে দিয়ে সোনালী তাকে সেটা বোঝাতে চায়। নিখিল মনে মনে বলল, সংসারে নিয়ম, পুবের জানালা খোলা রাখা। তোমাদের পরিবারে ঢুকে বুঝতে পেরেছি সেটা অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছে। ঝুল কালি পড়ছে। মাকড়সা জাল বুনে সেই জায়গায় বসবাস করতে শুরু করেছে। পশ্চিমের জানালা খোলা রাখ সোনালী ক্ষতি নেই। কিন্তু দেখ, পুবের জানালায় যেন মাকড়সা বাসা না বাঁধে। তারপর নিখিল নিজেই হা হা করে হেসে উঠল। সে কেমন গার্জেন হয়ে গেছে, কত কথা বলছে। বাবা জ্যাঠার মত ভাবছে। আর তখনই আবার মিউজিক।···আই হ্যাভ সিন ইউ ট্রয়াইস ইন অ্যা সর্ট টাইম / ওনলি অ্যা উইক সিনস উই স্টারটেড / ইট সিমস টু মি ফর এভরি টাইম / আই অ্যাম গেটিং মোর ওপন হার্টেড।

নিখিল পাশ ফিরে শুল। পা দুটো ভাঁজ করে শুল। সে এ-ভাবে শুয়ে আরাম পায়। একটা হাত বিছিয়ে দিয়েছে শরীরের ওপর। অন্য হাতটা চোখের ওপর ফেলে রেখেছে। আলোটা বড় চোখে লাগছে। আলো থেকে চোখ বাঁচাবার জন্য সে হাত কপালে

রেখে সামান্য অন্ধকার সৃষ্টি করে রেখেছে। কখনও কখনও অন্ধকার জীবনে বড় প্রয়োজন। এ-সময় নিখিলকে দেখলে তা টের পাওয়া যায়। বেশ ঠাণ্ডা আমেজ। কুলার বোধ হয় চলছে। তার একটা মৃদু গুঞ্জন খুব কান পাতলে শোনা যায়। মেয়েটা ওপেন হার্টেড হতে গিয়েই মরেছে। তারপরই মনে হল অনেক দূর থেকে যেন এক উচ্ছল নারী হাত তুলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। স্বাধীন জীবনে যা হয়ে থাকে। রেকর্ডের সঙ্গে তালে তালে নাচে। আঙ্গুলে তুড়ি দেয়। জিনসের প্যান্ট পরনে, হাফ হাতা খাটো সাদা স্কার্ট গায়ে। বড় করা চুল, আর মসৃণ মেঝেয় পা ঘুরে যাচ্ছে। সরু কোমরে ঢেউ উঠছে। মাথার ওপরে হাত। তুড়ি দিচ্ছে ত্নু আঙ্গুলে। আবার কখনও দেখতে পায় বেশ জোরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে সোনালী। পাশে কোন্ যুবক যেখান সেখান থেকে চকলেট কিনছে, আইসক্রিম খাচ্ছে, কোন বড় ক্লাবে ঢুকে আকণ্ঠ খাওয়া। সোনালী মদ খায় কি না সে এখনও জানে না। তবু কোন প্রেজুডিস নেই। এবং যা কবল খেতেই পারে জীবন তু দণ্ডের। তাকে সোনালী যতটা পেরেছে ভোগ করতে চেয়েছে ভোগ না করার মধ্যে যে বৈরাগ্যের আনন্দ আছে সোনালী তা টের পায়নি। তার বাড়িটা সে-দিক থেকে কোন উর্বরা আবাদী জমির মত একবার সোনালী যদি টের পেত, পূজা-পার্বণে কি যে এক আনন্দ থাকে জীবনকে বোঝার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর হাতের কাছে নেই। অথচ বিষয়টা সহজ নয়। সে আবার পাশ ফিরল। ঘুম সত্যি আসবে না আসলে সোনালী ছিল ফুল অফ লাইফ। আবার মিউজিক শুনতে পাচ্ছে—আই অ্যাম ক্রেজি এবাউট ইউ / কিসেস অফ ফায়ার বার্ণি বার্ণিং / তারপর থেমে থেমে খুব শান্ত গলায় সেই মিউজিকের মধ্যে কেউ বলে যাচ্ছে—হোয়েন ইউ শ্লিপ বাই মি সাইড / আই ফিল সেফ অ্যান্ড আই নো ·····ছাট মাই লাভ ইজ সো স্ট্রং······।

এ-ভাবে বার বার সেই এক মিউজিকের মধ্যে সোনালী কখন অদৃশ্য হয়ে গেল। কুয়াশার মতো এক অস্পষ্ট পৃথিবীতে সে চলে যাচ্ছে নিখিল এ-ভাবে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টেরই পাইনি। কুয়াশার মধ্যে

সে একবার দেখেছে আবছা মতো কেউ দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আরও অস্পষ্টতার মধ্যে এক মাইলের বনভূমি। এমনি সমারোহের মাঝে সে দেখল, সোনালীর দুটো মাথা পরীর মতো। বনভূমির ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। অজস্র যুবক নিচে দাঁড়িয়ে। তারপর এক কুৎসিত বিধাতা পুরুষ ডানা দুটো কেড়ে নিতেই সে পড়ে যাচ্ছে। নিখিল হাহাকার করে ছুটে যাচ্ছিল। আর তখনই ঘুম ভেঙ্গে গেল। দরজায় কেউ নক করছে। আশ্চর্য, আলো জ্বালা নেই। ঘর অন্ধকার। তার শরীরে কখন কে রাতে একটা সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়ে গেছে সে জানে না। জানালার কাছে সকালের প্রতিচ্ছবি শুধু দাঁড়িয়ে।

সোনালী দরজায় দুবার নক করে সাড়া পেল না। বেল টিপতে পারে। কিংবা দরজা খোলাই আছে। একটু ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখতে পারে, ওর ঘুম ভাঙল কি না! বাবার ব্রেকফাস্ট সাতটায়। ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ। এই ঘড়ির কাঁটা বিকেল পাঁচটার পর থেমে যায়। পাঁচটা থেকে রাত বারটা সময়টাকে যে যার মত পকেটে পুরে রাখে। খুশীমতো ব্যবহার করে। সারাদিনের শ্রমের পর সময়টার যথেচ্ছ ব্যবহার। বাবার সাতটায় ব্রেকফাস্ট। এই সময়টাতেই পিতা পুত্রীর একবার দেখা হয়। হাসি ঠাট্টা এবং বিদেশের কোন অভিজ্ঞতা নিয়ে সামান্য আলোচনা। অথবা কোন জার্ণাল থেকে বিচিত্র কিছু খবর সংগ্রহ করতে পারলে বাবা তার উল্লেখ করবেন। নতুন ছবি কি আঁকলে, চল না আবার বের হয়ে পড়ি, তোমার আজকাল দেখছি খুব বন্ধুবান্ধবের অভাব হয়ে পড়ছে এমন কিছু কথাবার্তা।

কোন সাড়া নেই মানুষটার! দরজা খুলে ঢোকা ঠিক না। কার কি-রকম শোওয়া, নিখিলবাবু বিরক্ত বোধ করতে পারে। দুদিন থেকে যা জ্বালাচ্ছে মানুষটাকে আজ আর সকালবেলা তাকে বিরক্ত করতে ইচ্ছে হল না। রাতে চুপি চুপি ঢুকে গায়ে সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়ে গেছিল। কেমন কুঁকড়ে শিশুর মতো শুয়ে আছে। ঘুমের মধ্যে টের পায়নি বেশ শীত করছে। আলো নিভিয়ে মানুষটাকে নিশ্চিন্তে

ঘুমাবার বন্দোবস্ত করে গেছে। আলো জ্বালা থাকলে কতটা অস্বস্তি সে জানে। আসলে কখন যে সে কি-ভাবে কার উপর বিরূপ হয়ে যায় নিজেও টের পায় না।

দরজাটা তখন খুলে গেল। নিখিলবাবুকে বেশ বোকা বোকা দেখাচ্ছে। ঘুমের পর মানুষের মুখে এক আশ্চর্য সরলতা ফুটে ওঠে। টের পাওয়া যায়, আসলে মানুষ সব সময় বড় অসহায়। এমনিতেই দুদিনে এক অপার্থিব মমতা বোধ করছে মানুষটার জন্য। নিরুপমের সঙ্গে এই বোধের কোথায় যেন এক যোজন দূরত্ব রয়েছে। নিরুপমের জন্য এখন শুধু জ্বালা অবশিষ্ট আছে। অথচ আগে সে একদিন না এলে কি ছটফট করত! সে জানালায় দাঁড়িয়ে দূরের মাঠে দেখত, লাল রঙের কোন গাড়ি আসছে কি না। ঝাউ গাছের গ্রীনকেলি পার হয়ে গাড়ি না দেখলে সে উদাস হয়ে যেত এক আসন্ন সঙ্গম লিপ্সার ব্যর্থতার জন্য। এখন কেমন সব ভোঁতা হয়ে গেছে।

নিখিল বলল, কি দেখছ!

কিছুটা সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল, একটু তাড়াতাড়ি করুন। সাতটায় ব্রেকফাস্ট।

—এত সকালে আমি কিছু খাই না। শুধু এক কাপ চা।

—না, লক্ষ্মিটি। আসুন। বাবা বসে আছেন। কিন্তু সোনালী দেখল, নিখিলের কোন তাড়া নেই। কেবল হাই তুলছে। সোনালী ঘরে যেতে যেতে বলল, এই নিন সব। বলে হাতের কাছে তোয়ালে টুথপেস্ট এগিয়ে দিল। শেষে সোনালী এমন করুণ চোখে তাকাল যে নিখিল আর স্থির থাকতে পারল না। সে সব নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। খাবার টেবিলে কি সোনালীর বাবার কাছে সমস্যাটা তুলে ধরবে। এও ভেবে অবাক, বাবা হয়ে কি তিনি কিছু খবর রাখেন না! সকাল বেলাতেই সে লক্ষ্য করেছে সোনালীকে কিছুটা বিবর্ণ দেখাচ্ছে। খেতে বসলে কেমন না খেয়ে উঠে পড়তে চায়। খাবারের প্রতি এই অনিচ্ছা থেকেই ত সব টের পাওয়া যায়।

ডাইনিং হলে ঢুকে নিখিল প্রথমেই আজ সোনালীর বাবাকে ভাল

করে দেখল। কে বলবে মানুষটার বয়স ষাট হবে দু চার বছর বাদে। শরীরে আশ্চর্য রকমের বাঁধুনি। একটাও চুল পাকেনি। নাকি ডাই করা। ডাই করা হোক না হোক মাথা ভর্তি চুল এবং কমনীয় মুখশ্রী। নিখিল নিজের বাবার কথা ভাবল। বয়সের তফাৎ দু জনের মধ্যে পাঁচ সাত বছরও হবে না। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার বাবা বুড়ো সন্ন্যাসীব মতো হয়ে গেছে। জীবন সম্পর্কে যেন বাবা বড় তাড়াতাড়ি দৌড় মেরেছেন। কোন রকমে শেষ হয়ে গেলেই এক নতুন জীবন। যেখানে ঈশ্বরের বসবাস। পুণ্যবান মানুষদের বুঝি এমনই হয়। কোন্‌টা পাপ কোন্‌টা পুণ্য ভেবে এই সময় সে বড দ্বিধায় পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাওয়া, বা দেরি করে জীবনকে ভোগ করতে কবতে পৃথিবীকে গুড-বাই করা!

সোনালীর বাবা বেশ কিছুক্ষণ আগে গুডমর্ণিং বলেছে। জবাবে সঙ্গে সঙ্গে গুডমর্ণিং বলা উচিত তার। তখন বলতেও বেশ সময় নিযেছে সে। তার আগে মাথার মধ্যে কত সব প্রশ্ন! সোনালীর বাবা হয়ত ভাবল, ম্যানারসের অভাব। সে বলল, গুডমর্ণিং।

অনেক দেরি করে, না কি লং প্লেয়িং রেকর্ডের মতো তাব কথার মধ্যে থাকে এক অতিকায় দূরত্ব। এখানে আসার পর থেকেই সে সেটা টের পেয়ে•কিছুটা বোধ হয় আহাম্মকও হয়ে গেছে। খুব স্বাভাবিক সেই। জবুথবু, যেন সব কিছু কাচের তৈজসপত্র, খনভঙ্গুর জীবনে কোথায় এতটুকুতে ফাটাফাটি বেধে যাবে সেই ভয়ে সন্তর্পণে চলাফেরা।

সোনালী পাশে পটে চা নাড়ছে। সব সাদা ন্যাপকিনে ঢাকা। সে নিখিলের আড়ষ্ট ভাব লক্ষ্য করে কাল থেকেই মজা পাচ্ছিল, কিন্তু আজ আর এতটা ভাল লাগছিল না। কখন যেন কূট কামড় মনের মধ্যে। আসলে মানুষটার ব্যাক-বোন দৃঢ় নয়। সে এত বড় সমস্যার কি সমাধান করবে! একটাই পথ খোলা। সাফসোফ করে গঙ্গাজলে ধুয়ে পবিত্র নারী করে তোলা তাকে। নিখিলের এই ধরনের স্বভাবটাই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তখন মমতাবোধে তেমন প্রবল পেরেক

আটকে থাকে না। কিছুটা ঢিলেঢালা হয়ে যায়। সে বলল, আসলে বাবা, নিখিলবাবু নাকি এত সকালে কিছু খায়ই না।

সোনালীর বাবা এতে অস্বস্তি বোধ করতে পারে ভেবেই সে বলল, না না, ও ঠিক বলে নি, আমি খাই।

নিখিল দেখল ব্রেকফাস্টে একরাশ খাবার। পটে আলাদা দুধ, কর্ণফ্লাওয়ার দুটো করে বড় সন্দেশ। ওমলেট এবং কিছু সুগন্ধী চানাচুর। বড় পটে চা বানিয়েছে সোনালী। আজ সাদা সিল্ক পরেছে। শরীরের রঙ যেন এতে আরও বেশী ফুটে বের হচ্ছে। একরাশ ঘন চুল এলো করা পিঠে। ওর বাবা এ-সময় অজস্র কথা বলছেন। সবটারই সে হুঁ হাঁ জবাব দিচ্ছে। কারণ কি-ভাবে কথা বললে স্বাভাবিক কথা বলা হবে সেটাই সে এখন পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারছে না। প্রথম ভাবল ওর বাবার রুচিবোধের প্রশংসা করতে হয়। বাড়ির স্থাপত্যে এত বেশী বিশেষত্ব যে সব বিষয়টাই তার কাছে এখন ডিজনিল্যাণ্ডের মত। কোন দিক থেকে আরম্ভ করা যায় এই ভাবতে ভাবতেই দুধ কর্ণফ্লাওয়ার তার সামনে হাজির। অর্থাৎ তার আগে ওমলেট এবং স্যাণ্ডউইচ সে সাবাড় করে ফেলেছে। সে শুধু বলল, আর আমাকে দেবে না সোনালী।

আরে খাও খাও ইয়ং ছেলে, এখন থেকেই খাওয়া ছেড়ে দিলে চলবে কেন? তোমাদের বয়সে আমরা কি না খেয়েছি!

নিখিল বলল, আপনারা অনেক খেয়েছেন, আমরা এত পাব কোথায়?

—তার মানে। ন্যাপকিনে তিনি মুখ মুছে বেশ সবিস্ময়ে নিখিলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন!

—দেশের যা অবস্থা!

—দারিদ্র্যের কথা বলছ!

নিখিল বলল, ঐ আর কি! যেন কোনরকমে লোকটার প্রশ্ন থেকে রেহাই পেতে চায়।

তিনি এবার চুরুট ধরালেন।—দারিদ্র্যের কথা না বলে বল অপদার্থতার কথা। সামর্থ তৈরি করতে হয়। ওটা কলাগাছ ফুঁড়ে বের করা

যায় না। দেশের মানুষ উদ্যমী না হলে তুমি কি করবে! সব কুঁড়ে। কিন্তু জান পশ্চিমের দেশগুলোতে এটা নেই। ওরা যেমন খাটে, তেমনি খায়। আমাদের লোকগুলো গাছতলায় বসে থাকতে পারলে সে আর কিছু চায় না।

এ বিষয়ে নিখিল সোনালীর বাবার সঙ্গে একমত। অফিসে সে এটা লক্ষ্য করে থাকে! ইউনিয়নের পাণ্ডারা যেন কাজ করতে হবে না ভেবেই পাণ্ডাগিরির পথটা বেছে নেয়। এতে মোড়লি করাও হয়, আবার কাজও করতে হয় না। এবং বড় স্বতন্ত্র থাকে সামনে। লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেলেই একদিন এ-দেশে মন্ত্রিত্ব পাওয়া যায়। স্কুল-ইন্সপেকশানে গেলে সে বুঝতে পারে, মানুষ কত কুচুটে হয়। সে দেখেছে একই মানুষ শিক্ষকতা করে, জোতজমি দেখে, আড়তদারি চালায়, ইটের ব্যবসা করে, জীবনবীমার দালালী পর্যন্ত করে। সেই আবার স্কুলকমিটির সেক্রেটারিও হয়। আর অধিকাংশ মানুষ শুধু দেখে যায়। গা করে না। যেন এই দেশটার এমনই হবার কথা। চোর জচ্চুরে দিনকে দিন ভরে যাচ্ছে। তারপর সোনালীর বাবার দিকে তাকিয়ে মনে হল, এক জীবনে মানুষ এতটাই বা করে কি করে! এমন স্থাপত্যে তার কত না খরচ! কত না অঢেল পয়সা থাকলে এমন সৌখিন হওয়া যায়।

সোনালীর বাবা এবার বোধ হয় উঠবেন। সোনালী কথা বলছে না। সে চুপচাপ এক কাপ চা খেল। দুটো ক্রিমকেকার বিস্কুট।

সোনালীর বাবা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ডায়েট কনট্রোল ভাল, তবে বোধ হয় এতটা ভাল নয়। বলে চুরুটে আগুন আছে কিনা দেখতে গিয়ে কি মনে হল কে জানে, তিনি ফের বলল, আজকাল সোনালী তোমাকে দেখে মনে হয় বোর ফিল করছ। কি ব্যাপার! বন্ধু-বান্ধবরা কেউ তোমার আর আসে না?

সোনালী বলল, আসবে না কেন! নিখিলের দিকে চোখ তুলে আবার নামিয়ে ফেলল।

নিখিলের মনে হচ্ছে খুবই পারিবারিক কথা। সহজেই সবার সামনে

বলা যায় না। নিখিলকে কি সোনালীর বাবা খুব আপনজন ভেবে ফেলেছে। কি জানি! আমাকে এখুনি বের হতে হবে। ঘড়ি দেখল। আজ অফিস কামাই করলে দুর্ভোগ হবে।

এই প্রথম সোনালীর বাবা নিখিলের পরিচয় জানতে আগ্রহী হলেন। বললেন, কোথায় আছ ?

কোথায় আছে বলতে, বালিগঞ্জের দিকে আছে বলবে, না সে যে সরকারি চাকরি করে তার কথা বলবে।

নিখিলের হয়ে সোনালীই জবাব দিল। আশ্চর্য মানুষ, চটপট কথা বলতে শেখেনি। সব কিছুই এত ভেবে চিন্তে বললে হয়! সে বলল, এডুকেশন সার্ভিসে আছে। কখনও এত কথা বাবা জানতে চায় না। আজ বাবাও কেমন একজন গ্রাম্য মানুষের মতো কথাবার্তা বলছে। এর পরই হয়ত বলবে, তোমরা থাক কোথায়। বাবা মা আছেন কিনা! ক' ভাই বোন। বিবাহিত কি না। নিখিলকে দেখেই বাবার কি ধারণা হয়ে গেছে খুব সরল সহজ মানুষ! তার বন্ধু-বান্ধবরা একটু অন্য রকমের। বাংলা বলবেই না। স্মার্ট, বুদ্ধিদীপ্ত এবং চটপটে স্বভাবের। কমল, হারাণ অভি যে কেউ এমন কি নিরুপম থাকলে ত এতক্ষণে এই ঘরে হাসাহাসি হুল্লোড় পপ সং সব মিলে এক আশ্চর্য সজীবতা লক্ষ্য করা যেত। সেখানে নিখিল সব সময় এত কম কথা বলছে যে বাবার অস্বস্তি হবার কথা। অথবা বাবা কি বুঝে ফেলেছেন, নিখিল কম কথার মানুষ। ডাঁট দেখাবার প্রলোভন থেকে মুক্ত। এবং এটাই হয়ত ছোঁয়াচে রোগের মতো বাবাকে নিখিল সম্পর্কে সামান্য উদার হতে সাহায্য করেছে। বাবা সহজেই নিখিলের নাড়ি নক্ষত্র জেনে নেবার জন্য গ্যাঁট হয়ে বসে গেল।

নিখিলের সঙ্গে বাবার খোলামেলা কথাবার্তা হোক সোনালী চাইছিল না। কারণ নিখিলবাবু যা একখানা মানুষ, দুম করে হয়ত বলেই দেবে, বাপ হয়ে টের পান না কি কাল-বীজ পুঁতে দিয়ে গেছে আপনার বাড়িতে। মেয়ে, আপনার আত্মহত্যা করতে বিলাস ভ্রমণে বের হয়েছিল! কখন গোপনে দু'জনে এমন কথাবার্তা হয়ে যাবে, এবং নিরুপম নামে এক ধূর্ত

ছোকরার কাজ এটা, অথচ সোনালী জানে, নিরুপম যেমন আগেও অস্বীকার করেছে, বাবার সামনেও তেমনি করে বলবে, এমন কি বাবাকে অপমান পর্যন্ত করতে পারে, বাবা যতই নিজেকে সফল মানুষ ভাবুন, আসলে বাবা বুঝি টেরও পান না, কত বড় পরাজয় তার জীবনে ঘটে গেছে। কাজ পাগলা আত্মকেন্দ্রীক মানুষের এ-ছাড়া বুঝি কোন নিস্তার নেই। নিজের চেয়েও বাবার জন্য তার কেন জানি আজ বেশী কষ্ট হচ্ছে। বাবা যতই নিজেকে মুক্ত মানুষ ভেবে থাকুন না, সে জানে, মা চলে যাবার পর বাবা মাঝে মাঝে সারারাত জানালায় দাঁড়িয়ে থাকেন। নকুল গভীর রাতে তাকে ডেকে নিয়ে যায়। সে দেখতে পায়, বাবা তার গ্রীনভেলির দিকে ফাঁকা মাঠে কি যেন অপলকে দেখছেন। সে ডাকে, বাবা। নিরুত্তর। সে আবার ডাকে, বাবা। জবাব আসে—হুঁ। এস ঘুমোবে। ছোট্ট বালকের মতো সে বাবার হাত ধরে নিয়ে আসে। বলে, ঘুমোও, চুলে বিলি কেটে দিচ্ছি। বাবা সত্যি তখন কেন জানি কোন রূপকথার রাজপুত্রের গল্প শুনতে চায়। কিন্তু সোনালীর ত কোন রাজপুত্রের গল্প জানা নেই। সে কোন ঘুমপাড়ানি গানও জানে না। অসহায় বালিকার মতো বাপের শিয়রে বসে থাকে। আর চুলে বিলি কেটে দেয়। এখন যদি কোন রাতে আবার নকুল এসে বলে, সাব জানালায় দাঁড়িয়ে আছেন, ঘুমাচ্ছেন না। সোনালী ছুটে গিয়ে বাবার হাত ধরে নিয়ে আসবে। শুইয়ে দিয়ে সে বাবাকে এখন থেকে একজন রাজপুত্রের গল্পও বলতে পারবে। সে আর কেউ নয়। নিখিলবাবু নামে এক রাজপুত্র। দুঃখিনী রাজকন্যাকে সে ভারি মমতায় সোনার কাঠি রূপোর কাঠি পাল্টে জাগিয়ে দিয়েছে। সোনালী জানে, সে আর যাই করুক, ফের আত্মহত্যা করতে পারবে না।

সোনালীর চমক ভাঙল নিখিলবাবুর হাহাকার হাসিতে। বাবা নিখিলবাবু একসঙ্গে হো হো করে হাসছেন। কি এত কথা হয়েছে যে নিখিলবাবু এমন দরাজ গলায় হাসতে পারছেন। সে নিজের মধ্যে ডুবেছিল আর এক কামড় দু কামড় করে ক্রিম কেকার খাচ্ছিল। খেতে ইচ্ছে করছে না। ওক উঠে আসছে। তবু খেতে হয়। আসলে খাওয়ার

অভিনয়। সকাল বেলাতেই মাথাটা সামান্য ঘুরে গেছিল। সে কাউকে ঘরে ডাকেনি। কিছুক্ষণ দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থেকে যখন টের পেয়েছে কিছুটা সুস্থ, তখনই ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে চোখে মুখে জল দিয়ে আবার স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করেছে। তারপর রুটিন মাফিক কাজকর্ম। সকালের ব্রেকফাস্টের কোথাও কোন যেন ত্রুটি থাকে না। নিখিলবাবুর দরজায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর ডেকে তোমায় কাজ—তত সব কাজের মধ্যে সময়টা তার গেছে।

কিন্তু এখন কি কথায় দুজন এমন হাসতে পারে। আসলে কি ওরা দুজনই ওর বিমর্ষ ভাব লক্ষ্য করে হাসি ঠাট্টা করে যাচ্ছিল। তার ডায়েট কনট্রোল নিয়ে বাবা ঠাট্টা করতে পারেন, কিন্তু নিখিলবাবু তো জানে সব। তার ত হাসা ঠিক হয়নি। নিখিলবাবু কি বিষয়টার ওপর আর তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। ফলে লঘু স্বভাবের হয়ে যেতে পারছে। লঘু স্বভাবের হলেই সহজে হাসির কথা না থাকলেও মানুষ হাসতে পারে। সে তার বাবার দিকে চেয়ে বুঝতে পারল, তাকে তারা লক্ষ্যই করছে না। এমন কি গূঢ় কথা থাকতে পারে! সে বিরক্ত হচ্ছিল এবং শেষে আর না পেরে বলল, বাব্বা তোমরা এত হাসতে পার!

—আরে নিখিল কি বলল, শুনলে না ত!

—কি বলেছে?

—নিখিল তুমিই বলনা!

—তোমার বাবার বয়স কত জিজ্ঞেস করেছিলাম।

সোনালী হাঁ হয়ে গেল। কি গ্রাম্য মানুষ রে বাবা। একটা হাঁদা। বয়েস জিজ্ঞেস করতে আছে? টিপিক্যাল বাঙ্গালী। সে বলল, আর কিছু জানতে চাওনি।

—না।

—বাবা, ও ঠিক বলছে আর কিছু জানতে চায়নি!

সোনালীর বাবা বলল, আরে নিখিল তোমার অন্য বন্ধুদের মতো নয়। সে আলাদা জাতের মানুষ। হি ক্যান আস্ক এনিথিং। তার রাইট আছে। আসলে মানুষের চরিত্র ধরতে আমার এক সেকেণ্ড সময় লাগে না।

—তোমাকে ও আর কি বলছে!

—এই বলল, ওর বাবার কথা। বয়সে আমি ওর বাবার চেয়ে বড় বিশ্বাসই করতে চাইল না! আজগুবি ভেবে হাসল। ও কত সরল, সেই ভেবে আমার হাসি পেল। তুমি তাতে এত বিচলিত বোধ করছ কেন!

—ওঃ। সোনালী কেমন শান্ত হয়ে গেল। তেমন কোন কথা না। সে বলল, নিখিল, নিচে গাড়ি রেডি। এর পরে গেলে অফিস দেরি হয়ে যাবে।

নিখিল যখন তার অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে বারান্দায় নামতে যাবে তখনই দেখল, সোনালীর বাবা ঘরের ভেতর থেকে তার দিকে হেঁটে আসছে। শান্ত ভাবলেশহীন মুখ। গভীর কোন চিন্তায় মগ্ন থাকলে মানুষের মুখ এমন দেখায়। সে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। নিখিলের মনে হল, শত হলেও সোনালীর বাবা। সম্পর্কে গুরুজন হন। তাঁকে প্রণাম করা উচিত। বাবা মা তাকে ছেলেবেলা থেকে এমন শিক্ষাই দিয়েছেন। বিষয়টা এখন তার সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। গুরুজনের আশীর্বাদ জীবনে বড় দরকার। সে সামান্য এগিয়ে গিয়ে টুক করে প্রণাম সেরে বলল, যাচ্ছি।

কতদিন পর যেন জীবনের আর এক অধ্যায় সোনালীর বাবার মনে ভেসে উঠল। সে যখন গ্রামের বাড়িতে বড় হচ্ছিল, কাকা জ্যাঠা কিংবা মামা মাসী এমনকি অন্য কেউ গুরুজন এলে নিখিলের মতোই টুক করে প্রণামটা সেরে নিত। তখন তার মনেই হত না মাথা নত করা মনুষ্যত্বের অবমাননা। তারপর যত দিন গেছে, বয়স বেড়েছে, কৃতি হয়েছে যত, তত কেন জানি হালফ্যাসান এসে তাকে গ্রাস করেছে। আসলে অহংকার এক ধরনের। সব মানুষকেই আর বড় ভাবা যায় না। কিছু কিছু মানুষকে বড় ভাবা যায়। সেটাও এক সময় সংখ্যায় এত কমে গেল যে শেষ পর্যন্ত একমাত্র মা বাদে জীবনে আর কোন তার গুরুজন থাকল না।

সোনালীর বাবা বলল, মাঝে মাঝে এস।

নিখিল বলল, আসব।

সোনালী ভিতর থেকে সব দেখছে। সে বের হয়ে আসছে না। তার কেন জানি আজ সংকোচ হচ্ছিল।

সোনালীর বাবা নিখিলের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে। ফের কি ভেবে বলল, তুমি জান সোনালী কেন দিন দিন নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে।

—নিঃসঙ্গ।

—খুব। বন্ধুবান্ধব কেউ আজকাল আসে না।

—আসে না কেন!

—সেই ত! ও ত এমন ছিল না। বড় হৈ-চৈ করতে ভালবাসত, তারপরই ফিস ফিস করে বলল, আমার বড় ভয় হচ্ছে নিখিল।

নিখিল বলল, না না, ভয়ের কি আছে! তারপর ভাবল, আসলে কি সেও জানে। দেখে মনে হল, জানলে, খেতে বসে এত জোরে হাসতে পারত না। সে গাড়িতে ঢুকে গেল। বাড়ির ভেতরে কেউ দাঁড়িয়ে দেখছে। সেটা লক্ষ্য করল না। কারণ শেষ বেলায় যেন জোর করেই সোনালী তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কথাবার্তা হয়ত ঠিক ছিল না, তার চালচলন সকালে সোনালীর অপছন্দ হতে পারে, যেন তাড়াতাড়ি বের করে দিতে পারলেই রক্ষা পায়। চাপা অভিমান কাজ করছিল নিখিলের মধ্যে। খাওয়ার টেবিলে না হলে আচমকা কেউ বলে গাড়ি রেডি! আসলে যেন সোনালী বলতে চেয়েছিল, আপনি যান। অনেক হয়েছে।

ঠিক গাড়ি ছাড়ার সময় দরজায় মুখ গলিয়ে সোনালীর বাবা বলল, তুমি এস কিন্তু। ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম। সোনালীকে ভুল বোঝনা। ওর বন্ধুরা ওকে ভুল বুঝেই হয়ত আর আসে না। মেয়ে বড় হয়েছে, বড় হলে বন্ধু-বান্ধবের বড় প্রয়োজন নিখিল। সেটা না থাকলে কোথাও অস্বাভাবিক কিছু ঘটে গেছে মনেই হতে পারে। ওর মা কাছে থাকলে আমার চিন্তা ছিল না। বলতে বলতে এই বয়স্ক মানুষের চোখ কেমন জলে ভার হয়ে এল।

খোলা আকাশের নিচে গাড়িটা চলতে থাকলে উপনগরীর সব বাড়ি ঘর তার চোখে পড়তে থাকল। পাখির খাঁচা পার হতেই মনে যে একটা দ্বিধা কাজ করছিল তা কেমন হালকা হয়ে যেতে থাকল। এই ক'দিন তার ভাল গেছে কি মন্দ গেছে সে তা নিয়ে ভাবে না। তবে সব সময় মনে হয়েছে একটা ভারি বিপজ্জনক দড়ির ওপর দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে। ছেলেবেলা থেকেই যে কোন সমস্যাকেই সে ভয় পায়। সে-জন্য যা হয়ে থাকে, নিখিলের ভাল মানুষ সেজে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। অফিসের কাজেকর্মেও সে কোন ত্রুটি রাখে না। কোন রন্ধ্রপথে ঘুন ঢুকে পড়বে কে জানে। দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন বলে এমন হয়, না হিসেবী মানুষ সে! এই সব চিন্তা-ভাবনা খুবই কাজ করছিল তার। সে জানে পৃথিবীতে কোন নারীকে তিন দিনে চেনা যায় না। তিন দিন কেন সারাজীবনেও চেনা যায় না। সোনালী যদিও আর তার কাছে অজ্ঞাতকুলশীল নয় তবু, এমন এক ঘরবাড়িতে সোনালী বড় হয়ে উঠছে যার সঙ্গে তার সবিশেষ পরিচয় নেই। সব চেয়ে বেশী দংশন করছিল সোনালীর গভীরে এক কীট বাসা বেঁধে বসে আছে। সোনালীর মতো মেয়েরা কি চায় সে সঠিক বুঝতে পারে না। এবং যখন ড্রাইভার সেলাম জানিয়ে চলে যাচ্ছিল তখনও একটা কথা বলতে পারেনি। বরং সে চলে যেতেই কেমন মুক্ত হয়ে গেল। আগের নিখিল হয়ে গেল। সবটাই তার কাছে স্বপ্ন কিংবা দুঃস্বপ্ন হয়ে থাকল। মেসে করিডোর দিয়ে ঢোকার মুখে সে শুনল কেউ তাকে কিছু বলছে!

—ক'টার গাড়িতে ফিরলেন বাড়ি থেকে?

সে অন্যমনস্কভাবেই জবাব দিল, রাতের গাড়িতে।

সে আর কিছু বলতে পারল না। অফিস টাইম বলে মেসবাড়িটাতে এখন ঠাকুর চাকরদের ছোটাছুটি চলছে। সে এক-পাশে তিনতলার ঘরে থাকে। সকাল হলেই তার জানালায় সূর্য উঠে আসে। পাশে রেল-লাইন। এবং পরে কিছু ঝুপড়ি, তারপর বাস রাস্তা। ইস্টিশনের সংলগ্ন বলে ভিড় ভাড়াক্কা লেগেই থাকে। সোনালী যখন সঙ্গে ছিল,

তখন এক ধরনের দুর্বলতায় সে ভুগছিল। আসলে সোনালী আশ্চর্য রকমের সুন্দরী মেয়ে। যে কোন পুরুষের পক্ষেই অবহেলা করা কঠিন। সেও তার শিকার হয়েছে। নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে শিকার কথাটাই তাকে কূট কামড় দিল। তা না হলে কত দুর্ঘটনা ঘটছে, খবরের কাগজ খুললে বিচিত্র দুর্ঘটনায় পাতা ভর্তি হয়ে থাকে। সোনালীর যদি কিছু ঘটেই যেত, এমনি আর একটা কী বেশী হ'ত।

এই সব ভাবনার মধ্যেই সে এক সময় অফিস চলে গেল। এবং কেন জানি মনে হল, সোনালী তাকে ঠিক ফোনে ধরবে। সোনালীর সঙ্গে অজস্র কথা হয়েছে, কোথায় থাকে তাও বলেছে, সোনালী তার বাড়িঘর দেখে এসেছে, ফলে যে কোন মুহূর্তেই সোনালী হুম করে একটা ফোন করে বসতে পারে। সে জানে, সোনালীর ফোনে শুধু একটাই কথা ফুটে উঠবে—তুমি কি ঠিক করলে!

আমার আবার ঠিক-বেঠিকের কি আছে! তুমি আগে ঠিক কর। তারপরই মনে হল আসলে সোনালী দুশ্চরিত্রা। এই কথাটা তাকে এমন গ্রাস করে ফেলল যে কিছুক্ষণ কেমন হতভম্ব হয়ে বসে থাকল। তিন দিনের মধ্যে এই কথাটা তার কিন্তু একবারও মনে হয়নি। বরং কোন মধ্য যুগীয় নাইটের মতো সে এক অসহায় রমণীকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছে! সব আবার ঠিকঠিক হয়ে যেতেই নিখিলের মধ্যে নানারকম ইতর কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। কেন যে ভিতর থেকেই কে বলে উঠল, এঁটো বাসনে কে খায় বল সোনালী। আমি ত মানুষ! আসলে কি, তার পেছনে দীর্ঘকাল ধরে যে জীবন বয়ে চলেছে, অর্থাৎ সে, তার বাবা-মা, বোন এবং যে ঐতিহ্যে সে মানুষ, সেখানে সোনালীর মতো মেয়েরা বেমানান! বুঝতে পারছে না, কেন এ-সব কুভাবনা সোনালী সম্পর্কে ধীরে ধীরে মাথায় এসে জট পাকাচ্ছে। সিগারেটের প্যাকেট খুলে দেখল, একটাও নেই। তারপর মনে হল গাড়িতে একটানা সিগারেট টেনেছে। আসলে নিখিল খুবই টেনশনে ভুগছে। বেয়ারা সারদা এসে দুটো ফাইল দিয়ে গেল। দু'জন শিক্ষক দেখা করতে চায়। তাদের অ্যাপ্রুভেলে কি সব গণ্ডগোল আছে। সে

বলল, ওঁদের বলে দাও, আমি দেখেশুনে শীগগিরই একটা ব্যবস্থা করব। কথা বলে কোন কাজ হবে না।

আসলে সে আজ সবাইকে কেন জানি এড়িয়ে চলতে চাইছে। এমন কেন হয়! এই ত মেসবাড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় বেশ মুক্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে, এখন কেন আবার তবে এত বিচলিত ভাব! আসলে সোনালী কামড় বসিয়ে দিয়েছে কল্‌জেয়, নিখিল শত চেষ্টা করেও তা থেকে মুক্ত হতে পারছে না।

সারাটা দিন ভারি আনমনাভাবে কেটে গেল। অফিসে কোন কাজ করতে পারল না। নন্দবাবু এসে তার মুখ দেখেই টের পেয়েছে, সে ঠিকঠাক নেই। নন্দবাবু তার পছন্দের মানুষ। অফিসে এই একটি মাত্র মানুষের সঙ্গে সে মন খুলে কথা বলতে পারে। সে মানুষটাও আজ তার সঙ্গে কথা বলে যেন সুখ পেল না। এটা ওটার পর নন্দবাবু বলেই ফেলল, আপনার কী যেন হয়েছে!

নিখিল বলল, কী আবার হবে!

—এই, কিছু একটা।

সে সাফ বলল, কিছু হয়নি।

—না হলেই ভাল। নন্দবাবু উঠে চলে যাচ্ছিল। নিখিলের মনে হল নন্দবাবু কিছু একটা টের পেয়েছে। সে চলে গেলেই সোনালী এসে তার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যেন নিজের আত্মরক্ষার্থেই বলল, বসুন না।

—কী বসব মশাই! একটা কথা বললে, আর একটার জবাব দিচ্ছেন। বাড়িতে কী কোন অসুখ-বিসুখ!

—না না। সবাই ভাল আছে।

—বাড়ি থেকে ফিরে এমন গোমড়া হয়ে গেলেন কেন?

—আমার মুখটা কি খুব গোমড়া!

—তাই ত! কানন বলল, স্যারের কিছু একটা হয়েছে। কারো সঙ্গে দেখা করছেন না। ফাইল পত্র খুলে বসে আছেন। শুনেই ভাবলাম দেখে আসি ছোট সাহেবের কি হল!

কানন তার খাস বেয়ারা। কানন এক পলকেই বুঝে ফেলেছে।

এটা উচিত নয়। তাকে স্বাভাবিক থাকা দরকার। সে হা হা করে হাসার চেষ্টা করল। পারল না। এতে বরং ওর বিচলিত ভাবটা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিল।

নন্দবাবু ফের ফিরে এসে বসলেন। অফিসের নানারকম ঝুট-ঝামেলা থাকে। ক্লিক আছে। কোন ক্লিক-টিকে জড়িয়ে পড়তে পারে ভেবে বলল, কোন খারাপ রিপোর্ট আছে?

—না ত!

—এই স্কুল-টুল নিয়ে। আজকাল ত দেশে সবাই নেতা। স্বাধীনভাবে কিছু করার উপায় নেই। কাঁটা তুলতে যাবেন, দেখবেন কাঁটার গায়ে নেতা মানুষদের আঁশ লেগে আছে।

—ও-সব কিছু না।

—কিছু নয় ত মেসে গিয়ে আয়নায় ভাল করে মুখটা দেখবেন।

নিখিল মেসে ফিরে কি ভেবে যথার্থই আয়নার সামনে দাঁড়াল। সে নিজেকে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মুখের অবয়বে কোন পরিবর্তন নেই। কেবল চোখের নিচে একটা দুশ্চিন্তার মাকড়সাকে হেঁটে যেতে দেখল। সে সোনালীকে আশ্বাস দিয়েছে। এই আশ্বাস শব্দটিই মাকড়সা হয়ে চোখের নিচে ঝুলছে। সে কি ভেবে বাথরুম ঢুকে গেল এবং সাবান দিয়ে মুখ অন্যদিনের চেয়ে বেশীই একটু ঘসল। তারপর ফের আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে বুঝল, ওটা লেগেই আছে। ভারি বিব্রত বোধ করতে থাকল। ঘরে থাকলে বোধহয় ওটা তার সারা মুখে জাল বুনবে। সে কেমন ভয়ে ভয়ে চোরের মত নিঃশব্দে বের হয়ে গেল এবং ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকল।

এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সব সুন্দরী রমণীরা সেজে-গুজে বের হয়ে পড়েছে। এরা সব সময় এত সেজে থাকে কেন! কোন পুরুষের প্রলোভন থাকে সব সময় এই সব নারীদের মধ্যে। চোখ মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়, তাদের চলাফেরা কথাবার্তা সবই কোন পুরুষকে উদ্দেশ্য করে। যেন উপাচার সাজিয়ে বসেই আছে—অনেকটা চাষ আবাদের জমির মতো।

আর কি যে হয়! সে কখন এ-ভাবে আরও দূরে চলে এসেছে টের পায় না। একটা পার্ক, গাছপালার ভিতরে টেনিসের কোর্ট। দু-জন যুবক টেনিস খেলছে। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে খেলা দেখল। প্লেজার শব্দটি মাথায় আবার কূট কামড় বসাচ্ছে। যুবক দু'জন আশ্চর্য রকমের প্লেজার পাচ্ছে বল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। প্লেজারের বাংলা প্রতিশব্দ কি হতে পারে ঠিক, এই সব ভাবল! আনন্দ, সুখ, না ঠিক যেন দাঁড়াচ্ছে না। যুবক-যুবতীরা এই প্লেজারের অন্বেষণে মা-বাবা হয়ে যায়। মূল কথা, মানুষ একজন নারী ছাড়া বাঁচতে পারে না। নারীও পারে না। বয়স বাড়ে, ফুল ফুটতে থাকে, আর তখন প্লেজার শরীরে শিরশির করে মাকড়সার মত গা বেয়ে ওঠে। সে সোনালীকে বাঁচিয়ে তুলেছে তার নিজস্ব প্লেজারের জন্য। সোনালী মা হয়েছে নিজস্ব প্লেজারে, কিন্তু এই প্লেজারজনিত ঘটনায় যে এসে গেল তাকে নিয়ে কি হবে!

এই ভাবে ঘুরেফিরে সে যখন মেসে হাজির হল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। পুলিন রাতের খাবার ঢেকে রেখে গেছে। সে হাতমুখ ধুয়ে এসে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। খুব ক্লান্তি লাগছে। মাঝে মাঝেই তিনটে মুখ এসে হাজির হচ্ছে। প্রথমে সোনালী তারপরই বাবা-মা। আশ্রমের মতো বাড়িটায় দেখতে পেল, কে যেন সব অলক্ষ্যে নিষেধের বেড়া তুলে দিচ্ছে। এতদিনের সংস্কার সেই গোপন প্রহরী কিনা বুঝতে পারছে না।

তখনই দেখা গেল, গলা বাড়িয়ে কেউ তাকে কিছু বলছে।

সে ধড়ফড় করে উঠে বসল।—আসুন আসুন।

—নাইট শো'তে গেছিলেন?

—না তো!

—আপনার জন্য একজন চিরকুট রেখে গেছে।

—কে?

—নিন।

একটা চিরকুট। শুধু লেখা—বসে থেকে পেলাম না। কোথায় যান! সোনালীর হস্তাক্ষর। সব কথাগুলি সাপের মতো যেন মাথা উঁচিয়ে

আছে। অথবা সব কথা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, যে ফূর্তি লোটার সে লুটছে। সোনালীকে তছনছ করে রেখে গেছে। কেমন দায়িত্বহীন। না মানুষের স্বভাবেই এটা থাকে! তার কি দরকার ছিল সোনালী সম্পর্কে এত কৌতূহলের। সে তো নিজের জালে নিজে জড়িয়ে গেছে। আসলে তার মনেও ছিল এক প্লেজার। সোনালীকে দেখার, ছোঁয়ার প্রলোভন। কোন সকালে যদি দেখতে পায় জানালায় সূর্যমুখী, তখন কার না আনন্দ হয়। নিরুপম যা প্রত্যক্ষভাবে লুটে নিয়েছে, গোপনে সে তা সোনালীর লুটতে চেয়েছে। তা না হলে তাজা নারী দেখলে সে এত আকুল হয় কেন! ফলে নিখিল কেন জানি নিজের ওপরই বিরক্ত হল। সোনালী যে এতটা আবার ছুটে এসেছে তার জন্য দায়ী সে নিজে। খেতে বসে খেতে পারল না।

আর পরদিন সকালেই সে সোনালীর ফোন পেল।—হ্যালো!

—কে ?

—আমি সোনালী।

—কেমন আছ ?

—ভাল নেই। আপনি কি ঠিক করলেন!

—কী ঠিক করব আবার!

মনে হল সোনালী ও-পাশে কিছুটা থমকে গেছে। কথা বলতে পারছে না।

নিখিলই বাধ্য হয়ে বলল, অবুঝ হবে না!

কেউ কিছু বলছে না। সাড়া নেই ওপ্রান্তে।

—সোনালী!

সাড়া নেই।

—সোনালী, আমার বাবা মা'র কথা ভেবে দেখ।

—নিখিলবাবু!

বড় দূর থেকে যেন সোনালী কথা বলছে।

—নিখিলবাবু, আমি সারাজীবন কারো কথা ভাবিনি, শুধু নিজের কথা ভেবেছি। এ-অসময়ে আপনি কেন মাসিমা মেসোমশাইর কথা

তুলছেন! কাল ত আপনি এমন ছিলেন না! গাড়িতে আপনি আমার মাতৃত্বের মর্যাদা দিয়েছিলেন।

নিখিলের কপাল ঘামছিল। দূরবর্তী জীবন মানুষকে কখনও উদাসীন করে রাখে। কাল সোনালীর জন্য সে বড় টান বোধ করেছে। কাছ থেকে সরে আসতেই কোন বেতার সংকেতের মতো অজস্র প্রশ্নবোধক চিহ্ন শূন্যতায় ঝুলিয়ে রেখে গেল কেউ। সে সরাসরি কিছুই বলতে পারছে না। বলতে পারছে না, সোনালী, আমি এ-ভাবে বেড়ে উঠিনি। গাছপালা বাবা যাই রোপণ করেছেন তাকে খুশি মতো বেড়ে উঠতে দেননি। ব্যক্তিগত প্লেজারের চেয়ে বাবা সমষ্টিগত প্লেজারের বেশী মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু সে জানে সোনালীর কাছে এ-সব কথা একেবারেই অর্থহীন।

নিখিল বলল, দেখ সোনালী, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না—কি করব বুঝে উঠতে পারছি না। সোনালী রাগ কর না। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ। আমি জানি তুমি কষ্ট পাবে—কিন্তু সোনালী, আমি ত মানুষ। আমি মানে তোমার সঙ্গে আমার কেন যে দেখা হয়েছিল! নিখিল চিৎকার করে কথা বলতে গিয়ে শুনল, সোনালী ওর কথায় হাসছে! সোনালী—তুমি হাসছ!

সোনালী বলল, এত ভাবতে হবে না!

—সোনালী শোন, তুমি আমাকে কথা দাও!

—কি কথা নিখিলবাবু?

—কথা দাও, তুমি আমার কথা শুনবে?

—আপনার কী কথা।

—যা হয় দু'জনে পরামর্শ করে করব!

—আপনি কি নাবালক নিখিলবাবু?

নিখিল ভাবল সে কি সত্যি এলোমেলো কথা বলছে?—আমি নাবালক হতে যাব কেন সোনালী।

—পরামর্শ কার সঙ্গে?

নিখিল বলল, আমার সঙ্গে।

—কি নিয়ে!

—এই মানে ভ্রূণটা নিয়ে।

—এটা ত আমার ভাবনা।

—না তোমার একার ভাবনা নয়। আমারও।

—নিখিলবাবু। সোনালী ফের বলল। নিখিলবাবু, ওকে নিয়ে ভাববার কিছু নেই। সে যখন এসে গেছে, আমি যদি বাঁচি সেও বাঁচবে। আমার প্লেজার ওকে জন্ম দিয়েছে। সে কত সুন্দর ভেবে দেখুন!

—তাই বলে সমাজ সংসার তুমি বাদ দিতে চাও?

—আপাততঃ, আমার কাছে ওর চেয়ে বড় সত্য কিছু নেই।

নিখিল আর কথা বলতে পারল না। তার কপাল এবং মুখ ঘেমে গেছে। এই শেষ হেমন্তে নিখিল কেমন একজন জলমগ্ন মানুষের মতো গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকল। ও-প্রান্ত থেকে কেউ কথা বলছে না আর। সোনালী বুঝি ফোন ছেড়ে দিয়েছে। নিখিল একজন পর্যুদস্ত মানুষের মত সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। ওর চার পাশে সব আত্মীয়-স্বজন ভাই বোন বাবা মা'র ছায়া ছায়া প্রেতাত্মারা ঘিরে আছে। সে যেন এই প্রেতাত্মার জীবন ছাড়িয়ে কিছুতেই বেশী দূরে যেতে পারে না। ফাঁকা মাঠে তার দাঁড়াবার সাহস নেই। সোনালী বোধ হয় আবার কিছু একটা করবে। তার ভেতরে বড় হাহাকার বেজে উঠল। সে সোনালীর মতো এক লাফে বেড়াটা পার হতে পারছে না।

সোনালী বিড় বিড় করে বকছে তখনও। হাতে রিসিভার। ওরা কেউ আর কোন কথা বলছে না। ট্রুথ শব্দটি মাথার মধ্যে মগজের ভেতর থেকে ফুটকরি তুলছে। মগজের সর্বত্র এই শব্দ তোলপাড় তুলে দিয়েছে। সে এক পা নড়তে পারছে না। সে রিসিভার জোরে কানের কাছে চেপে নিখিলের শেষ কথা শোনার আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কোন সাড়া নেই। সে যেন এক নিঃসঙ্গতার চূড়ান্ত সীমায়। এই ঘরে কোন পিন পড়ার শব্দ পর্যন্ত নেই। সব কেমন থেমে গেছে। সে দুবার হ্যালো বলল। না, নিখিলবাবু তার শেষ বাতিঘরের মতো দাঁড়িয়ে

নেই। তার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। বড় নিঃসঙ্গ, বড় খালি মনে হচ্ছে সব কিছু। অসহায় ভীত বালিকার মতো চিৎকার করে উঠল, আমি তার কাছে প্রমিজ বাউণ্ড। ফোনে তবু সাড়া নেই। সে বুঝল নিখিলবাবু ফোন কেটে দিয়েছে। মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরে কানে কেউ যেন শিস দেয়। সে বুঝতেই পারেনি নিখিল অনেকক্ষণ আগেই লাইন কেটে দিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা ঘুরে গেল। শেষ বাতিঘরও সে হারিয়েছে। এবং মনে হল পা টলছে। সব ঘুরছে। পায়ের তলাকার কার্পেট নড়েচড়ে উঠছে। সে কেমন বেসামাল হয়ে পড়তেই ফোনের স্ট্যাণ্ডে হাত বাড়াল তারপর আর কিছু দেখতে পেল না। সব অন্ধকার। এবং যখন জ্ঞান ফিরে এল বাবা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। ডাক্তার সুখেন্দু বাবাকে কি বলছেন!

বাবা জানালার দিকে তাকিয়ে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। সোনালী শুনতে পেল শুধু বাবা বলছেন, দিস ইজ মাই ফেট। তারপর খট খট শব্দ শুনতে পেল। ডাক্তার চলে যাচ্ছে। কেউ দৌড়ে যাচ্ছে। বোধহয় নকুল। ডাক্তারের ব্যাগ হাতে নিয়ে নামছে। সে বাবার অবিচল দাঁড়িয়ে থাকা দেখেই বুঝেছিল, ঠিক সেদিনের মতো—মা'র শেষ কথা, আমি তবে পাগল হয়ে যাব। বাবা আর একটা কথা বলেননি। ঠিক এমনি অবিচল দাঁড়িয়ে। সোনালী বাবার এমন দাঁড়িয়ে থাকা সহ্য করতে পারছে না। চোখ বুজে ফেলল। নারীরা মানুষের জন্য বার বার পাগল হয় কেন!

কতক্ষণ চোখ বুজেছিল টের পায়নি। সংকোচ হচ্ছিল, ভয় হচ্ছিল, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। শুধু কোনরকমে চোখ বুজে পড়ে থেকে বড় ক্ষীণ গলায় বলল, জল।

সে চোখ বুজে আছে। কেউ পা টিপে টিপে কাছে আসছে। এবং শুনতে পেল, নাও। বুঝতে পারছে বাবা নিজেই আজ জলের গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছেন। সে উঠে বসতে চাইল, বাবা বললেন, উঠছ কেন! উঠতে হবে না। ডোণ্ট বি নার্ভাস। বাবা জল খাইয়ে মুখ মুছে দিলেন। সোনালীর কান্না পাচ্ছিল। দু চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

বাবা বললেন, কান্নার কি হল।

সোনালী আর স্থির থাকতে পারল না। হাহাকার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

কান্না প্রশমিত হলে সোনালী বুঝতে পারল, বাবা তার শিয়রে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। সোনালী শরীরের শাড়ি সায়া ঠিক করে নিচ্ছে। এবং পেটের দিকটায় কিছুটা অস্বাভাবিক, শাড়ি সায়া যদি ঠিক না থাকে, এখন পারলে যেন সে বাবার কাছে আপাদমস্তক ঢেকে রাখতে চায়। বাবা উঠে নিজেই পায়ের নিচের চাদরটা বুক পর্যন্ত ঢেকে দিলেন। চাকর-বাকরের উপর ভরসা করতে আর তিনি সাহস পাচ্ছেন না। আর তখনই সে বাবার ধীর স্বাভাবিক গলা শুনতে পেল। তিনি বলছেন, নিরুপমকে চিঠি লিখছি।

—না। সোনালী ভীষণ জেদী বালিকার মতো 'না' উচ্চারণ করল?

—তবে কাকে?

সোনালী নিরুত্তর।

—একজনকে ত চিঠি লিখতেই হবে। সেটা কে বললে ভাল করতে।

সোনালী বলতে পারত কেউ না। যে অস্বীকার করে তার মূল্য কোথায়। আর কেউ যদি রাজীই না হয় তাতেই ক্ষতি কি। মাথা কাটা যাবে তোমার। ভয় নেই। তুমিই ত বলেছ যা সত্য তাকে গোপন করতে নেই, অস্বীকার করতে নেই। যত বাধা বিপত্তিই আসুক আমি তাকে অস্বীকার করতে পারব না।

বাবা চুরুট ধরালেন। সোনালী অমনি চোখ বুজে আছে। লাইটারের ক্লিক শব্দটা বড় বেশী জোরে কানে বাজছে। চুরুটের গন্ধটা নাকে লাগছে। এ-সব উল্টা-পাল্টা গন্ধ পেলেই তার ওক উঠে আসে। সে একটু সরিয়ে নিল শরীরটা, মুখও। বাবা বোধ হয় এই মুহূর্তেই কোন ফয়সালার কথা ভাবছেন।

—তোমার অন্য বন্ধুরা? অভি অনল ঠিক সব নাম মনে আসছে না, তোমার প্রেসিডেন্সির বন্ধুরা, আর্ট কলেজের কেউ। আমার দিক থেকে কোন আপত্তি উঠবে না। হোয়েন ইট ইজ হেপেণ্ড .....।

তারপর থেমে বললেন, এরা কেউ না। না বললে, হাউ ইউ একসপেক্ট যে এটার সলিউশন বের করা যাবে। এ-সময় তোমারই আমাকে সাহায্য দরকার।

—তা'লে কি সোম ?

—না না।

—বিশ্ব !

—না বাবা না।

—কে তবে ? কেমন রূঢ় গলা বাবার।

—জানি না, আমাকে কিছু প্রশ্ন করবে না বাবা। আমি জানি না, জানি না।

—নিখিল !

সোনালী এ-সময় কি বলবে ভেবে পেল না।

—সে তো তোমার সেদিনের······আই মিন, এর আগে ওকে দেখিইনি। খুব ভাল ছেলে। যদি হয়ে যায়—তবে বল, কি কিছু বলছ না কেন। নিখিল! বল বল। ও কি রাজী হচ্ছে না। গা ঢাকা দিতে চাইছে। চোর ছ্যাঁচোড়ের মত স্বভাব! কাপুরুষ! তুমি বলবে ত!

সোনালী চোখ বুঁজে পড়ে আছে।

—আজই যাচ্ছি। ফোন নাম্বার জান! স্কাউনড্রেল! তাই এত ভীতু স্বভাবের ছেলে। জোরে হাসতে জানে না! এ-বাড়িতে এসে চোরের মত পা টিপে টিপে হাঁটছে। শক্ত পায়ে হাঁট। এ-সব এমন কি ঘটনা যার জন্য পালিয়ে বেড়াতে হবে। আঃ, তুমি এমন চুপচাপ থাকলে চলবে কেন! ফোন নাম্বার জান না ? কিছু বল, ঠিক আছে, ওর হোয়েয়ার বাউটস বের করতে আমার এক দণ্ড লাগবে না। দেখছি ইউ আর ফিলিং ভেরি সাই রিগার্ডিং দ্যাট বয়। ঠিকই ধরেছি। বলে তিনি উঠতে গেলে সোনালী উঠে বসল, কোথায় যাচ্ছ বাবা!

—ওর কাছে যাব।

—না না, ওর কোন দোষ নেই।

—দোষের কি আছে! এটা দোষ বলেছি! গিল্টি মাইণ্ডেড ছোরা। আমার পাল্লায় পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। বলতে বলতে তিনি চলে যাচ্ছেন। সোনালী অপলক তাকিয়ে আছে। বাবাকে বারণ করার সাহস এ-মুহূর্তে সে কিছুতেই সঞ্চয় করতে পারল না। সে উঠে পড়ল। কেলেঙ্কারী হবে। কিন্তু ভিতরে এত সব সত্ত্বেও ওর কেমন মজা বোধ হচ্ছিল। তার যেন নিখিলকে চাই। নিখিল ভীতু স্বভাবের মানুষ। সে আর যাই করুক, নিরুপমের মতো ব্লান্টলি তাকে অসম্মান করতে পারবে না। সে জানে, নিরুপম অস্বীকার করবে। কিন্তু নিখিল শুনে মাথা নিচু করে বসে থাকবে। বাবাকে বলতে পারবে না, না না, আমার এ-ব্যাপারে কোন রেস্পনসিবিলিটি নেই। আমাকে কেন জড়াচ্ছেন।

সোনালী একাই এখন কথা বলছে নিজের সঙ্গে। নিখিল, আমার শিশুটির একজন বাবা দরকার। নিখিলবাবু আপাততঃ আপনি এইটুকু সাহায্য করুন। আপনার কাছে আমি চিরকালের দাসী-বাঁদি হয়ে থাকব। নারীর এত দুর্লভ বস্তু থাকে আমার আগে জানা ছিল না। সে নিজের পেটে হাত রেখে বলল, কি রে, রাগ করলি! নিখিলবাবু খুব বড় জাতের মানুষ। হি ইজ গ্রেট। এমন একজন মানুষের সন্তান হওয়ার সৌভাগ্য কম ছেলের হয়। এই বলে সেই দীর্ঘাঙ্গী রমণী ডাকল, নকুল। নকুল এলে বলল, পুবের জানালাটা খুলে দাও। আমি আজ সাদা কাশফুলের মাঠ দেখব। এবং কেন জানি নিখিলের কথা যত ভাবছিল, সোনালীর তত শরীরে শিহরণ খেলে যাচ্ছিল।

নিখিল বাসি দাড়ি গালে নিয়ে বসেছিল। এ-ঘরটা শেষ প্রান্তে বলে কিছুটা নিরিবিলি। সে তার ইজিচেয়ারটাতে পা ছড়িয়ে বসে আছে। অফিস আছে, এখন খুব দ্রুত সব কাজ সারা দরকার, এই যেমন দাড়ি কামানো, স্নান বাথরুম সব এ-সময়টায় সারতে হয় দ্রুত। সে তার আজ কিছুই করছে না। টেবিল ক্লকটা টিক টিক করে বাজছে। আসলে সে বুঝে ফেলেছে সব সময় সেই নারী তার জানালায় দাঁড়িয়ে

থাকে। ক'দিনে কোথাকার এক যুবতী তাকে এত কাহিল করে দিল! কেউ কেউ দেখা হলেই বলে, কি নিখিলবাবু তোমার হয়েছেটা কি! পরশমণি পেয়ে হারিয়েছ! কথা বলছ না। নিজের দিকে মন নেই। কেবল কি ভাব!

এই সব অদ্ভুত ধরনের কথাবার্তা শুনতে হবে ভেবে ভয়েই সকাল থেকে ঘরে চুপটি মেরে বসে আছে। কিন্তু যত একা থাকে ভাবনাটা তাকে পাগল করে দেয়। সোনালীর জেদ, সে যে বড় অসামাজিক কাজ করে ফেলেছে, কথাবার্তায় এখন আর তা মনেই হয় না, ওর বাবাকে সব খুলে বলা দরকার। কিন্তু এ-সব কথা কি করে শুরু করা যায় সেটাই সে জানে না। বার বার মন থেকে সোনালীর চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছে। ভেবেছে, আর এ-সব নিয়ে ভাববে না। সোনালী তার কেউ না। তারপরই মনে হয় অদৃশ্য এক বন্ধন কোথায় যেন ক'দিনে তৈরি হয়ে গেছে। যত দিন যাচ্ছে গেরোটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। সে কেমন হাসফাঁস করতে থাকল।

আর এখনই মনে হল কেউ কাউকে বলছে, ওদিকটায় থাকে। শেষ ঘরটার।

—ও কি আছে?

—আছে বোধ হয়।

এবং জানালায় সে দেখতে পেল সোনালীর বাবা। সৌখিন মানুষটির পোশাক-আসাক টিপটপ। গলায় হলুদ রঙের টাই। সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে উঠে পড়ল। ঘরের যা শ্রী হয়ে আছে! দু-হাতে যা কিছু নোংরা সরিয়ে ফিটফাট করতে গিয়ে দেখল, তিনি দরজায়। খুব ধীর গলায় বলছেন, ব্যস্ত হতে হবে না। বস। তারপর ঘরে ঢুকে বললেন, ছাইদানিটা দাও।

মুখে চুরুট থাকলে, তাঁকে এমনিতে বেশী গম্ভীর দেখায়। তিনি কিছুক্ষণ অপলক নিখিলকে দেখলেন। তারপর বললেন, দাড়ি কামাওনি কেন!

নিখিল বাধ্য ছেলের মত বলল, বাথরুমে যাব যাব করে দেরি হয়ে গেল।

—অফিস যাচ্ছ না!

—শরীরটা ভাল নেই, যাব না ভাবছি।

—দেখি হাত।

—না না, তেমন কিছু হয়নি।

—তা'লে অফিস যাবে না কেন। অযথা কামাই করা ভাল না। ডে বাই ডে দেখছি সিনিয়ারিটি রসাতলে যাচ্ছে। ইফ য়ু হ্যাভ সিনিয়ারিটি, দেন জীবনে তুমি বড় হবেই। একটা জাতি গুনলি এরই অভাবে ডুবে যাচ্ছে। আসলে কি জান আমরা বড় রকমের কোন যুদ্ধ করিনি। এটা দরকার। যুদ্ধ বিধ্বস্ত জার্মানীকে না দেখলে সেটা বোঝা যায় না। স্ট্রাগল ইজ দ্য প্লেজার এটা আমরা ভুলে যাই।

এগুলো তিনি কেন বলছেন নিখিল বুঝতে পারছে না। সে একজন নির্বোধ মানুষের মতো সব হা করে শুনছে। কিছু বলছে না। মানুষটা জানেই না, পশ্চিমের জানালাটা খুলতে গিয়ে পুবের জানালাটা তার একদম বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে মাকড়সা জাল বুনছে। অতিকায় মাকড়সাটা জাল বুনেই যাচ্ছে। ঝিল্লিগুলো ক্রমশঃ ঘন হচ্ছে। কালো পর্দার মতো চোখে ভেসে উঠছে আবার অন্ধকার। সে বলল, যাব।

—নিশ্চয়ই যাবে। তুমি না যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, আজ অনেক মানুষের কাজ আটকে থাকা। এ ত গাড়ির লাইন। একটা ডিরেইলড হলে, বাকিগুলো ডেড হয়ে থাকে।

নিখিল প্রায় কোন কথাই বলতে পারছে না। প্রথমতঃ বুঝতে পারছে না, হঠাৎ তিনি এখানে কেন! কি দরকার। মানুষটা ব্যস্ত বড় জীবনে। তার সময় থেকে এই সময়টুকু অপচয় অহেতুক ভাবল। অথবা তিনি কি কোন পরামর্শ করতে এসেছেন। সোনালী কি তার বাবাকে শেষ পর্যন্ত সব খুলে বলেছে! আর তখনই মনে হল, সে ঠিকমতো আপ্যায়ন করছে না মানুষটাকে। কেমন ভেবলু হয়ে বসে আছে। সে তাড়াতাড়ি দরজার বাইরে গিয়ে ডাকল, পুলিন। কোন সাড়া নেই। একজন বোর্ডারকে দেখে বলল, দাদা পুলিনকে একটু পাঠিয়ে দেবেন ত! তারপরই মনে হল, এমন রাজসিক মানুষের জন্য সে কতটা কি করতে

পারে। নিতান্ত এক কাপ চা, এবং ওমলেট, দুটো ক্রিম কেকার। কিন্তু তিনি কিছুই হয়ত খাবেন না। হয়ত দয়াপরবশ হয়ে চা-টুকু খাবেন। এ-সব সত্ত্বেও তার কিছুটা করা দরকার। আর কিছু না হ'ক, এই ফাঁকে সে কিছুটা স্বাভাবিক হতে পারবে।

তখনই মনে হল, মানুষটি আবার হাঁকছে—ম্যান, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা আছে। ইয়ং ম্যান তুমি বড়ই ভীতু বালক।

নিখিল সবটা শুনতে পায়নি। তিনি অনবরত কথা বলছিলেন। সব কথা তার মগজে আজকাল ঢোকে না। একটা দুটো কথা শোনার পরই সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সে বলল, আমাকে কিছু বলছেন!

—হাঁ। কথা বলছি। বলে তিনি চুরুটে আগুন আছে কিনা দেখলেন। বোঝাই যাচ্ছে, মানুষটি নিখিলের সঙ্গে কি-ভাবে জরুরী বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা শুরু করবে বুঝতে পারছেন না। কিছুটা তিনি নিজেও যেন বিচলিত বোধ করছেন।

কথা বলছি বলায় নিখিল কিছুটা যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। বড় গম্ভীর গলা। কিছু বললে ত কথাই বলতে হয়। এ-জন্য স্পষ্ট করে কি বলার দরকার ছিল কথা বলছি! তিনি স্পষ্ট হতে চান, অর্থাৎ সোনালীর এত বড় বিপর্যয় গেছে, সে আত্মহত্যা করতে চায়, গাড়িতে তুমি সঙ্গী ছিলে, দেখা করলে অথচ সে-সম্পর্কে আমাকে বিন্দুবিসর্গ জানালে না, তুমি কেমন লোক হে! তোমার কি কোন আক্কেল দাঁত ওঠেনি। নিখিল এই সব ভেবে মনে মনে বলল, কি করে বলি! সে ফের উঠে দাঁড়াল। পুলিনটা এলে কিছু একটা অজুহাত খাড়া করে বারান্দায় ঘুরে আসতে পারত। এমন গম্ভীর স্বর শোনার তার এতটুকু অভ্যাস নেই। মানুষটার মুখোমুখী বসে থাকতেও সাহস পাচ্ছে না। না বলে সে সত্যি অপরাধ করেছে। শত হলেও সোনালী মানুষটার আত্মজা। সোনালী অসহায় বোধ করার পর সবই শেষ পর্যন্ত ফাঁস করে দিতে পারে। সে না পেরে বলেই ফেলল, বলব ভাবছিলাম······কিন্তু······

—কিন্তু কি!

সে মাথা চুলকে বলল, এতে মনে হয়েছিল সোনালীকে ছোট করা হবে।

—ছোট করা হবে ?

—তাই ত।

—সত্য প্রকাশ হলে তুমি জান মানুষের মহত্ত্ব বাড়ে।

—আমরা ত এ-ধরনের সত্যে বিশ্বাসী নই।

—আমরা বলতে কাকে বোঝাচ্ছ।

—আমরা মানে এই···

—আসলে তুমি ব্যাকডেটেড্। তুমি কি করে ভাবলে···জানি না, ইয়ং ম্যান, তুমি এটা ঠিক কাজ করনি।

নিখিল শেষ পর্যন্ত আর না পেরে বলল, সত্যি ঠিক কাজ হয়নি, আপনাকে বলা উচিত ছিল সব খুলে।

তিনি কথা বলছিলেন এবং চারপাশ লক্ষ্য রাখছিলেন। তাদের কথার মধ্যে আবার তৃতীয় ব্যক্তি কেউ না থাকে। এ-সব পারিবারিক কথা তার এখানে ঠিক বলাও উচিত নয়। নিখিলকে আজ রাতে খেতে বলবেন ভাবলেন। এবং সেখানেই বাকিটুকু বলা ভাল। ভিতরে ক্ষোভ আছে এটা আপাততঃ একেবারেই প্রকাশ করলেন না। আর ক্ষোভ প্রকাশ করে এখন না হয় পরেও কোন লাভ নেই। যা হবার হয়ে গেছে। মুখে যেটুকু চুনকালি লেগেছে সেটুকু মুছে ফেলতে পারলেই আপাততঃ রক্ষা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ যা হয়ে থাকে মানুষের, কোন ঘটনাতেই মুষড়ে পড়তে নেই—এ-সব নিয়ে জল শেষ পর্যন্ত অনেকদূর গড়ায়। বিচক্ষণ মানুষদের যা স্বভাব, সব দিক রক্ষা করে চলা। সোনালীকে রূঢ় কথা বলা যাবে না। নিখিলকেও না। এ-সব এত স্পর্শকাতর যে এর থেকে কি অঘটন ঘটবে বলা যায় না। যে-জন্য তিনি খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা ঘটেছে—মানুষেরই এটা হয়, এবং মানুষ কেন প্রাণীকুলের সবত্র, অর্থাৎ প্রকৃতির জীবনধারায় এমনই হবার কথা। তা নিয়ে মাথা গরম করলে নিজেকে এবং জীবনধারাকে ছোট করা হয়। এ-সব আপ্তবাক্য নানাভাবে ভেবে তিনি এত সংযত এবং সংযমী। আচরণে কোথাও তার বিন্দুমাত্র ক্ষোভের প্রকাশ নেই। বরং নিখিল খুব ছেলেমানুষ, সোনালী আরও—এরই মধ্যে

তিনি ক্ষোভের জ্বালা নিবারণের একটা সহজ আত্মরক্ষার পথ খুঁজে বের করেছেন।

চা ডিম ক্রিমক্রেকার এলে বেশ খুশীই দেখাল মানুষটাকে। চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, বেশ চা-টা। একটু একটু করে ডিম ভেঙ্গে মুখে দিলেন। সঙ্গে ক্রিমকেকার এবং বড় সুস্বাদু খাবার। নিখিলের যা আশংকা ছিল, তা সম্পূর্ণ অমূলক প্রতিপন্ন করে সবই চেটেপুটে খেয়ে ফেললেন।

নিখিল মানুষটার এই অমায়িকতায় খুবই খুশী। এবং এখন সে আর বিব্রত বোধ করছে না। স্বাভাবিক কথাবার্তা শুরু করে দিল।—আপনার চিনে আসতে কষ্ট হয়নি!

—আরে না, না। এলাম, তুমি রাতে খাবে। সোনালী বার বার বলল, ওকে বলে আস। ও যা মানুষ, ফোনে বললে হবে না। ওঠার সময় বললেন, নিখিল, আমি কাউকে কিছু বলিনি। ওর মাকেও না। তুমি আর আমিই জানি। ডাক্তার এসেছিলেন সকালে।

—ডাক্তার!

—হুঁ।

তারপর উঠে পড়লেন। এখানে আর না। খেতে খেতে কথা হবে রাতে। তুমি আসছ ত!

নিখিল মাথা নিচু করে বলল, যাব। তারপর যে কখন তিনি বের হয়ে গেলেন, নিখিল তাও লক্ষ্য করল না। একজন বাবার পক্ষে, সংসারের পক্ষে এটা কত বড় অবমাননার বিষয় তখন নিখিলকে দেখলে তা টের পাওয়া যাবে। আসলে যে-মানুষের একমাত্র আত্মজার গর্ভে নামগোত্রহীন একটা মানুষের বাচ্চা বড় হচ্ছে তার দিকে তাকাবার সাহস নিখিলের কেন জানি ছিল না। যেন এটা সব মানুষের ক্ষেত্রেই সমান অবমাননার বিষয়। সে নিজেও সোনালীর বাবার মতো এই বিষয় প্রসঙ্গে কেমন সমব্যথী হয়ে গেল। সোনালীর বাবা চলে গেলে সে বিছানায় অনেকক্ষণ চুপচাপ চোখ ঢেকে শুয়ে থাকল। তাকে নিমন্ত্রণ করার অর্থ, তিনি বোধ হয় ভেবে পাচ্ছেন না কী করবেন! সোনালী

যদি বলে থাকে, লেট মি লিভ উইথ মাই প্লেজার। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, সেই বা কী করবে! সোনালীর বাবার চেয়ে তার দূরত্ব আরও প্রখর। সে তো তৃতীয় ব্যক্তি। তৃতীয়? না তাও না। চতুর্থ। তৃতীয় ব্যক্তি সোনালীর বাবা। প্রথম আসামী নিরুপম। নিরুপম না সোনালী! কে কাকে সিডিউস করেছে। সোনালী যদি করে থাকে। আর এই সব কথা মাথায় ঢুকলেই সোনালী সম্পর্কে কেমন সে তিক্ততা বোধ করে। সেই প্রথম চেনা সোনালী, কিংবা গাড়ির সোনালী এবং বাড়ির সোনালী সব হারিয়ে যায়। তখন সোনালীকে বড় নির্লজ্জ এক রমণী মনে হয়।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত সে অফিস যেতে পারল না। কারণ সে বুঝল, অফিসে গিয়ে কাজে মন দিতে পারবে না। আয়নায় নিজের মুখ দেখল। মুখে কেমন কূট সব চিন্তার রেখা। সে ক'দিনে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। তার সারাজীবনের ভাল হয়ে থাকার বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। সে তার বাবা মা'র বড় অনুগত সন্তান। সে ভাইদের কাছে একজন আদর্শ পুরুষ, বোনেরা দাদার ঋজু চরিত্রের জন্য গর্বিত। আত্মীয়রা—তা নিখিল, আজকাল এমন ছেলে দেখা যায় না। বড় হতে হতে যে সত্য সে আবিষ্কার করেছিল, সোনালী তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এমন গোপন লজ্জাকর ঘটনার সে একজন অংশীদার যদি হয়, তবে আরও কুৎসিত হয়ে যাবে। কারণ সারাজীবন সে বুঝতে পারছে চারপাশে অবিশ্বাস বয়ে বেড়াবে। বাবা, মা, ভাই, বোন, আত্মীয় পরিজন সবার। এমন কি সোনালীরও। সোনালীকে সে যে ভালবাসতে পারবে না এবং দিন যত যাবে, তত এক অবিশ্বাস কিংবা সোনালীর নির্লজ্জ ভূমিকা তাকে ভীতু করে রাখবে ক্রমেই সেটা সে বুঝতে পারছিল।

এর ওপরে যদি সোনালী তার প্লেজার নিয়ে বাঁচতে চায় তবে ত কথাই নেই। সে এতটা কিছুতেই পারবে না। দু-মাস যেতে না যেতেই সব পরিস্কার হয়ে উঠবে। বাবা মা ভাববে—তবে এই! এই আদর্শ! শেষে রেগে গিয়ে নিখিল আয়নাটা ঘুরিয়ে রেখে দিল। কেমন যেন নিজের

মুখ দেখতে তার ভয় করছে। সে চিৎকার করে বলল, না আমি পারবনা সোনালী। অন্যের বোঝা বহন করার ক্ষমতা আমার হবে না। শুধু কি তাই—সে ঘরের মধ্যেই অসহায় বালকের মতো পায়চারি করতে থাকল—আমার কি বিশ্বাসের বুনিয়াদ চিড় খাবে না! আমি ত মানুষ সোনালী। বয়স বাড়তে বাড়তে একদিন না একদিন ট্যারচা চোখে তাকাবই!

এই সব সাত পাঁচ ভাবনার মধ্যেই কখন যে বিকেল হয়ে গেল, কখন যে বারান্দা থেকে হেমন্তের শেষ রোদটুকু চলে গেল, নিখিল টের পায়নি। না গেলে কেমন হয়! চুল ব্যাকব্রাস করতে করতে আবার বলল, না গেলে কেমন হয়! আমি তোমার কে হে! ক'দিন আগে আমি কোথায় তুমি কোথায়। কিন্তু সে জানে এ-সব ভাবতে ভাবতেই জামা প্যান্ট পাল্টাচ্ছে। কোন এক অদৃশ্য টান তাকে ক্রমেই কাবু করে ফেলছে। সে দৌড়ে সিঁড়ি ধরে নেমে গেল। বড় সৌভাগ্য ট্যাক্সি পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। উঠেই শুধু বলল, সল্ট লেক। সেকটর টু। এবং আরও সব কথা বলে সে গাড়িতে শরীর এলিয়ে দিল। চারপাশের ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে না। কেবল সব কিছুকে সে দেখতে পাচ্ছে, সোনালী বড় ইজেলের সামনে ছবি এঁকে চলেছে। সেই ছবি—দূরবর্তী এক মাঠে, নিঃসঙ্গ এক পুরুষ হেঁটে যাচ্ছে। অথবা গাছপালার ফাঁকে একটা লম্বা হাত বের হয়ে আছে। হাতটা তার গলা টিপে ধরতে চায়।

তখন সোনালী পরে আছে সাদা সিল্কের ম্যাক্সি। চুল শ্যাম্পু করা। সকালবেলায় সে যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল কে বলবে! বাবা ফিরে এসেই বলেছেন, নিখিল রাতে খাবে আমি সেখানেই বিষয়টা পাকা করে ফেলতে চাই। তোমাদের জন্য আমি কেন ভুগব! বল, আমি কেন ভুগব? বাবার কথাবার্তায় এত হাস্ ছিল যে সে কিছু বলতে পারেনি। বাবা জীবনেও তাকে এ-ভাবে কথা বলেনি। আনন্দ মানুষের কেন তবে থাকে! যে-মুহূর্তটি তাকে, নিরুপমকে আবেগ মথিত করেছিল, সে মুহূর্তটির কি ত্রুটি! সেটি তার কাছে বড় দুর্লভ মুহূর্ত। কারণ,

নিরুপমের সঙ্গে শরীরের বিষয়ে জানাজানি হয়ে যাবার পর সে খুবই কামার্ত হয়ে থাকত। নিরুপম ঘর থেকে চলে গেলে সে হাহাকার বোধ করত। কারণ তার ছবি আঁকা এবং ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কোন কাজ ছিল না। কাজ থাকলেও আয়নার সামনে দাঁড়ালে একজন পুরুষের বড় প্রয়োজন বোধ করত। দশ বছর পার না হতেই সে জানে তার বাবার বন্ধু তাকে একটু বেশী আদর করত। আরও বয়স বাড়তে—তার ত তখন চোদ্দও পার হয়নি, সেই সুপুরুষ মানুষটি একদিন সহসা জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়েছিল। এবং পুরুষের ঘ্রাণ নাকে এসে লাগতেই কেমন ঘৃণা এবং অতিশয় নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে যাওয়া। গাছ ফুল পাখি যেমন বাড়ে, তেমনি সেই বোধ তাকে ক্রমে কাতর করতে করতে একসময় নিরুপম নামে এক পুরুষের শরীর তাকে গ্রাস করল। প্রথম প্রথম একজন অসমবয়সী মানুষেব সঙ্গে সে যে পাপ বোধ করত নিরুপম এসে যাওয়ায় তাও কেটে গেল। তবে কি মেয়েরা অনন্ত এক যৌন গারদে বন্দী। যে-কোন একজন কাছে থাকলেই, সুপুরুষ কাছে থাকলেই তার চলে যায়!

এই সব ভাবনার ফলে সে উঠে বসেছিল। তারপর হেঁটে সোজা স্টুডিওর ভিতর ঢুকে দরজা জানালা খুলে দিতে বলেছিল। ইজেলে বিরাট একটা ক্যানভাস চালিয়ে রঙ খুলতে বসে গেল। সে কোন রমণীর ছবি আঁকার বাসনাতে লম্বা লম্বা সব হলুদ দাগ কেটে গেল। এবং শরীরের যা রং হয়, তেমনি রঙে বিচিত্র এক পোষাক রমণীর গায় দেবে ভাবল। অকালে মাথার মধ্যে অনন্ত এক যৌন গারদে বন্দী কথাটা খুবই এলোমেলো ভাবে ছোটাছুটি করছে। এক রাস চুল, ঝড়ের হাওয়ায় উড়োক। রমণীর দু' হাতে চাপা মুখে আকাশপ্রান্তে চোখ। ঝড়ে শাড়ি সায়া সব উড়ে গেছে। শুধু সারা শরীরে যৌন গারদে বন্দী এমন এক অবয়বে ধীর স্থির নারী তাকিয়ে আছে এক জলাশয়ের দিকে। এ-সব চিন্তা মাথায় কাজ করলেও কিছু রেখা বাদে ছবিটাতে আর কিছু ফুটে উঠল না। নারী না গাছ তাও বোঝা গেল না। আসলে সে বুঝতে পারছে তার মাথা ঠিক নেই। নিখিল আসছে। নিখিল কি

বলেছে বাবাকে সে জানে না। বাবা কি নিখিলকে স্কাউণ্ড্রেল বলেছেন? কারণ বাবা মুখে না বললেও, মনে মনে ভেবেছেন। নিখিলকে স্কাউণ্ড্রেল ভাবলে তার জোর থাকে না। অথবা নিখিল যে সাহায্যের হাত গাড়িতে বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেটা কেন! সে যুবতী না হলে নিখিলের বোধ হয় এতটা দায় থাকত না। নিখিলবাবুও আসলে তলে তলে এই শরীরের ভেতরের সবকিছু শুঁকে টের পেয়েছে ভারি সুঘ্রাণ। বিড়াল যেমন মাছের ঘ্রাণে পাঁচিলে ঘুরে বেড়ায় তেমনি আর কি। নিরুপমের মতো সে আসলে সাহসী যুবক নয়। গৃহকর্তার হাতে লাঠি আছে টের পায় সে। এবং ফলে পাঁচিলের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া উপায় থাকে না। নিরুপমের সে-সব ভয়ের বালাই ছিল না। বর্তমান ছাড়া সে কিছু বোঝে না। প্লেজারের পক্ষে নিরুপমের গুণাবলী তার কাছে সব সময় সেণ্ট পারসেণ্ট মার্ক পেয়েছে। নিখিলবাবুর শ্লেটে সে এ-বিষয়ে খুব উদার হলে একটি গোল্লা বসিয়ে দিতে পারে। সেই মানুষ আসছে। মুখোমুখী বসে কথা হবে। নিখিলবাবু জেনে আসছে সব। কারণ বাবার ধারণা, তার গর্ভের ভ্রূণটি নিখিলের স্পারমাটোজা থেকে সংগৃহীত। এর উদ্ভব নিখিলবাবুর রক্ত থেকে। এবং একটা বৃহদাকারের এঁটোলি পোকা তলপেটে নিয়ে নিখিলবাবুর সামনাসামনি হবে— সেখানে মানুষটির কোন দায়িত্বই নেই—কথাবার্তা শুরু করার সময় বাবা ঘন ঘন চুরুট পাল্টাবেন। অথবা বাবা কি সব সেরেই এসেছেন। নিখিল রাজি। অথবা নিখিলবাবু নিরুত্তর থেকেছে। কারণ সে জানে নিখিলবাবুর আদপে সাহসই নেই অস্বীকার করে—এই ভ্রূণের দায় আমার নয়। অযথা আমাকে জড়াচ্ছেন। এর দায় নিরুপম নামে একজন ফ্যাশন দুরস্ত উঠতি ছোকরার। তাকে পাকড়াও করুন।

এই সব ভাবতে ভাবতে কপালে তার ঘাম হচ্ছিল। সে দাঁড়িয়ে আছে ইজেলের সামনে। অন্যমনস্কভাবে তুলি বোলাচ্ছে। শেষে কেন যে মনে হল ছবিটা তার অজান্তেই একটা বিশেষ আকার নিয়ে ফেলেছে। সত্যি আশ্চর্য, এক একটা ছবি করতে তার কখনও মাস পার হয়ে যায়, কখনও দিনের পর দিন ছবির নিচে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে —

কোন্ দিক থেকে তুলি টানলে, সেই ভাঁজ ফুটে উঠবে ভাবতে অনেক সময় পার হয়ে যায়—অথচ আশ্চর্য, আজ ভাবনা চিন্তার আগেই ছবিটা একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ইজেলে ফুটে উঠেছে।

ছবিটা দেখতে দেখতে তার নামাকরণ কি করবে ভাবতে লাগল। তুলির আঁচড়ে ছবির সর্বত্র এক যৌন-গারদের ছবি ফুটে উঠেছে। একজন নারী উলঙ্গ হয়ে থাকলে যা হয়! তার নরম উরুর ভাঁজে, ভ্রূভঙ্গিতে, চোখের কাজলে, ঠোঁটের রক্তিম আভায়, লাবণ্যময় গ্রীবায়, পুষ্ট স্তনে গভীর নাভীমূলে সর্বত্র অনন্ত এক যৌন-গারদ। সে কেন এমন ছবি আঁকল। তার কি তবে নিরুপমের উপর প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠেছে। না কি আসলে নিজের উপর। সে এত সাজগোজ করত কেন! সে কি করে বুঝল শরীরে তার অপার রহস্য সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য মানুষ পাগল। সে ত সেই পাগল করা অস্তিত্বকে কাট ছাট করেনি, বরং সেখানে যা ঘাটতি ছিল, কৃত্রিম সাজগোজে তাকে ভরে তুলেছিল! আসলে নারীরা হাজার হাজার বছর ধরে এই শিক্ষা পেয়ে এসেছে, তুমি হে নারী শুধু পুরুষের ভোগের নিমিত্ত। তা থেকে তোমার পরিত্রাণ নেই। যতই তুমি ওম্যান-লিব বলে চিৎকার কর না কেন! তোমরা এক একজন মানুষের খাঁচায় বন্দী সুন্দরী। বন্দী সুন্দরী ভাবাতেই সোনালী কেমন ক্ষেপে গেল। সে ছবিটার উপর তুলি থেকে অযথা কিছু কালো রঙ ছুড়ে মারল—তারপর ঠেলে ফেলে দিল ইজেলটা। নকুল হুড়মুড় করে কিছু পড়ার শব্দে ছুটে এসেছে। দেখছে ছোট মেমসাব জানালায় হাত রেখে হাঁপাচ্ছে।

সে ভাবল খবরটা সাবকে দেবে। করিডোর ধরে সিঁড়িতে নেমে যেতেই সেই নতুন বাবুটির সঙ্গে দেখা। নিখিল বলল, সোনালী কোথায়?

—ওপরে।

সে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে থাকল। নকুল তাকে নিয়ে যাচ্ছে। সোনালী পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, কে! কে!

—আমি নিখিল। তুমি এমন ভাবে তাকিয়ে আছ কেন!

—অ তুমি। মানে আপনি।

নিখিল পাশের ডিভানে বসে বলল, তুমি এত ঘামছ কেন! দরজার ও-পাশ থেকে নকুল তখন অদৃশ্য হয়ে গেল।

—ঘামছি!

—হুঁ।

পাশ থেকে তোয়ালে নিয়ে আলতো করে মুখ মুছে বলল, কখন এলেন!

—ঘরে আলো জ্বালাওনি কেন?

—মনে নেই।

—খুব ভয় পাচ্ছ।

—না তো!

সোনালী সহসা উঠে দাঁড়াল। পুরুষ মানুষ দেখলেই আজ কেন জানি ওক উঠে আসছে।

—কোথায় যাচ্ছ সোনালী।

—বসুন আসছি।

সোনালী চলে যেতেই আবার দরজাটা আপনি আপনি বন্ধ হয়ে গেল। এবং ধীরে ধীরে আলো ফুটে উঠল। প্রথমে অস্পষ্ট আলোতে সে কিছু টের পায়নি। বুঝতে পারছে নকুল তাকে সোনালীর স্টুডিওতে এনে বসিয়েছে। সোনালী তবে আজ সারাদিন ছবি এঁকেছে। সোনালীর শরীর যতটা খারাপ ভেবেছিল তা নয়। এবং তখনই দেখল একটা ইজেল পড়ে আছে। একটি ছবি পড়ে আছে। সে ইজেলটা খাড়া করল। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারছে না। কিছু খোলা ঝিনুকের মতো ঔজ্জ্বল্য, সাদা সাদা বরফি কাটা কি যেন, গোল অথবা ত্রিভুজাকৃতি কোন থ্রি ডাইমেনসানের ছবি হয়ত। সে ছবি বোঝে না। কিন্তু আশ্চর্য, ছবিটা থেকে সে কিছুতেই চোখ তুলতে পারছে না। কালো হিজিবিজি কিছু ফোঁটা কিংবা দাগ। তার ভেতর কি এক আকুলতা রয়েছে, যা ছবিটা ভাল করে নীরিক্ষণ না করলে বোঝা যায় না। কিন্তু অনেকক্ষণ দেখেও ছবিটা সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। সোনালী হাত

মুখ ধুয়ে ফের এসেছে। গরদের শাড়ি পরনে। চুল খোলা। চোখে কোন কাজল অথবা মুখে কোন প্রসাধন নেই। প্রায় সারা অঙ্গ ঢেকে সে ঘরে ঢুকেছে। যেন একটা বোরখা পরে সর্বাঙ্গ ঢেকে আসতে পারলে আরও ভাল হত। পুরুষেব নির্লজ্জ হতে বাধা নেই। কারণ তারা কোন স্বীকারোক্তির চিহ্ন বহন করে না। সে বলল, আগামী জন্মে যেন পুরুষ হয়ে জন্মাই নিখিলবাবু।

এমন অপ্রত্যাশিত কথাবার্তা নিখিলকে ছবি থেকে কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক করে রাখল। এ-কথা কেন! তারপরই মনে হল, সোনালীর শরীরে বিজবিজে ঘা ছেয়ে গেছে। সে যতই শরীর ঢেকে রাখুক তা সন্ধানী চোখে ধরা পড়বেই।

নিখিল বলল, পুরুষ হয়ে কি করবে?

সোনালী ডিভানে মাথা এলিয়ে দিয়ে বলল, আপনি আমার কথার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা চান?

সোনালী আজ তীর্যক কথাবার্তা শুরু করেছে। চোখে মুখে রূঢ়তার ছাপ। সে তাকে দেখে এক বিন্দু যেন খুশি হয়নি। তার যেন এখানে আজ না এলেই ভাল হত। নিখিল বলল, সে তোমার খুশি। কোন কিছুতেই কারো উপর কোনো চাপ সৃষ্টি করার স্বভাব আমার নয়।

সোনালী এমন কথায় হা হা করে হেসে উঠল। হাসিটা বড়ই বিভ্রান্তিকর। কেমন ভয়ের, আশংকার—হাসিটা খুব স্বাভাবিক মনে হল না নিখিলের।

সোনালী তেমনি চোখ বুজে পড়ে আছে। হাসির কথা নিখিল কিছুই বলেনি, তবু সে হেসেছে। আসলে ব্যক্তি নিখিল তার পাশে এ-মুহূর্তে বসে নেই। পুরুষের প্রতিভূ হয়ে যেন মানুষটা তার পাশে বসে মজা দেখছে। সোনালী চোখ বুজেই বলল, জানেন, ঘরের বাইরের কোনো কাজে কোনো মহিলা যত উৎসাহী, সে-অনুপাতে এ-সমাজে যৌনসঙ্গী হিসেবে তার আকর্ষণীয়তা তত কম। একজন দুর্ধর্ষ পর্বতারোহী বা অভিযানকারী যে কোন রমণীরই মন জয় করতে পারে। কেন না

তার কৃতিত্ব পুরুষ মানুষের যৌন ভূমিকার শোভা বাড়ায়। ঠিক একই গুণের এমন কোন বিখ্যাত নারী পুরুষ-হৃদয়ে কিন্তু ঠিক একইভাবে সাড়া জাগাতে পারে না। কারণ চলতি সমাজ-ব্যবস্থা যা আপনারা অর্থাৎ পুরুষ তৈরি করে রেখেছেন, সেখানে সেটা বেমানান। চলতি সংস্কৃতিতে মেয়েলী যৌন সত্তার যে ছবি পুরুষ মানুষের চোখে এঁকে রেখেছে তার সঙ্গে ওই সব কৃতিত্ব ঠিক মেলে না। একজন মহিলা খুব ভাল গান, এই তথ্য যতোটা গ্রহণযোগ্য সমাজে, ততটা নিশ্চয় নয় যে একজন খুব ভাল হকি খেলেন। এমন কি একজন মহিলা খুব ভাল ঘর সাজাতে পারেন এই বোধ যতটা পুরুষের মনে সেক্স অ্যাপিল আনে, ততটা যদি তিনি ভাল ছবি অথবা কবিতা রচনা করেন তেমন অ্যাপিল কিছুতেই আনে না। আসলে মেয়েরা যাই করুক সে যে কামিনী এই তথ্য তাকে সামনে রেখে আর সব কাজ করে যেতে হবে। বাইরে এক পা বাড়ালেই নারীর সৌন্দর্যের হানি হয়— চলতি সমাজ-ব্যবস্থায় এমনই অলিখিত আইন। বাইরে পা বাড়ালেই নারী আর পুরুষের কামণীয়া থাকে না।

নিখিল যেন কোন প্রাজ্ঞ মহিলার কাছ থেকে অনেক দূরের কথাবার্তা শুনছে। সোনালী কোন আর কথা বলছে না। সে সুযোগ বুঝে বলল, এ-জন্য আগামী জন্মে পুরুষ হয়ে জন্মাতে চাও ?

—হলে ভাল হয়। আর যাই হোক প্লেজারের সঙ্গে তাকে কোন কলঙ্ক বহন করতে হয় না।

—তাহলে বুঝতে পারছ, তুমি খারাপ কিছু একটা করেছ। নিখিল উঠে পড়ল। কারণ সে জানে হয়ত সোনালী আবার প্রগাঢ় কথাবার্তা শুরু করে দেবে। দার্শনিক হয়ে যাবে, অথবা তাকে দার্শনিকের মতো চিন্তাভাবনা করতে শেখাবে।

কিন্তু কি যে হয় মানুষের—এই রমণী তাকে বড় আকর্ষণে ফেলে দিয়েছে। এই ক'দিনেই সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে নিখিল। চলতি নিয়মকানুন তাকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দিলেও সে দ্রুত ভয়ের জায়গাটা হেঁটে পার হয়ে যেতে পারছে না। তাকে বার বার হোচট খেতে হচ্ছে।

নিখিল দেখল, সোনালী তার সেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগে সে তা ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, এখন দেখছে, সেটা আবার কেউ আগের মতো তুলে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এটা কার কাজ সে বুঝতে পারছে না।

ছবিটা সোনালী তাঁকে বুঝিয়ে দিল, পুরুষের আধিপত্য নারীর ওপর প্রতিষ্ঠাই ছবিটার মূল লক্ষ্য। তবে কি সে ভেতরে ভেতরে এই চলতি সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেতে ভয় পাচ্ছে। আর কিছুক্ষণ বাদেই বাবা হয়ত খাবার টেবিলে নিখিলকে শেষ কথাগুলো জানাবেন। না কি বাবা আগেই জানিয়ে এসেছেন! ভেবে বুঝল, তা হয় না। মিথ্যা অপবাদের পর নিখিল এ-ভাবে তার সঙ্গে কথা বলতে পারে না। কারণ সে যদি কোন রমণীকে গর্ভবতী করত এবং সমাজের চোখে যদি তা হেয় হয়ে দেখা দিত, কে জানে নিরুপমের মতো সেও অস্বীকার করত কি না। মানুষকে জায়গামতো না পেলে ঠিক বোঝা যায় না।

সে আবার তার আগেকার প্রগাঢ় কথাবার্তা শুরু করে দিল। বলল, আপনি আমার পাশে বসুন নিখিলবাবু। পাশে থাকলে আমি জোর পাই। আমি আমার সত্যকে বাঁচিয়ে রাখার সাহস পাই। বলে সে আঁচলে শরীর ঢেকে আরও গোপনীয়তায় ভেসে গেল। যেন পুরুষরা তার কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গই দেখতে না পাক, কারণ তার নখে পর্যন্ত কামনার চিহ্ন ফুটে আছে। সে বলল, জানেন নিখিলবাবু, প্রাণীকূলে সব জীবব্যবস্থাই পরস্পরের যৌন অনুমোদন ও আগ্রহ উদ্রেক করার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানুষের সমাজে তা হয় না। কারণ আমাদের যৌন অনুমোদন এবং আগ্রহ বিষয়ক নিয়মকানুন যতো না জৈব তার চেয়ে বেশী কৃত্রিম। কৃত্রিম কেন না সভ্যতা নামক বানানো বিষয় দিয়ে তৈরী এবং এটার সবটারই কারিগর পুরুষ। কিরকম মেয়েমানুষ পুরুষদের পছন্দ শুধু তাই নয়, কিরকম পুরুষ মেয়েদের পছন্দ হওয়া উচিত তাও পুরুষদের তৈরী সভ্যতা মেয়েদের মুখস্থ করায়। উদাসীন ভবঘুরে যুবক আমাদের প্রেম সংস্কৃতির একজন মার্কামারা নায়ক। আর, একজন উদাসীন ভবঘুরে যুবতী—না ভাবা যায় না, ডাক্তার ডাক, মাথা খারাপ,

চিকিৎসকের খোঁজ খবরের দরকার হয়ে পড়ে। এই পার্থক্যটুকু বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ কেউ তলিয়ে দেখেননি। একজন মেয়ে যতোটা কামিনী কেবলমাত্র ততোটাই প্রাণী। যৌনতার বাইরে তার এমন কোন দ্বিতীয় অস্তিত্ব নেই যাকে সমাজ প্রয়োজনীয় বলে মনে করে।

নিখিল বলল, মেয়েদের সম্পর্কে এত ভেবেছ আমি জানতাম না।

সোনালীর মনে হচ্ছিল তার সায়া শাড়ি আবার বুঝি আলগা হয়ে যাচ্ছে। একজন জ্বরো রুগীর মতো সে সারা শরীর ঢেকে রাখার চেষ্টায় কেমন আকুল। সব সময় আঁচল টেনে গলার ভাঁজ পর্যন্ত ঢেকে রাখতে চাইছে। যেন তার শীত শীত করছে। সে কাতর গলায় বলল, না নিখিলবাবু, আমি ভাবিনি, আমাকে কেউ ভাবিয়েছে।

—সেটা কে ?

—সেটা একজন লেখক। নারীসত্তার ওপর তার সুচিন্তিত কথাবার্তা, আমাকে কেমন একটা আবেগে ফেলে দিয়েছিল। আমি স্বাধীনতার স্বাদ বহন করতে চেয়েছিলাম। এখন যত দিন যাচ্ছে, বুঝতে পারছি আমার ভূলুণ্ঠিত হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

নিখিল যেন এত কথার পরেও সোনালীকে কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না। আসলে সে একটা প্যাঁচে পড়ে গেছে। ফলে নিখিলের এ-সব শোনার আগ্রহ কম। সে আসলে তার সঙ্গ চায়। তার সবটা চায় না। সবটা চাইলে, এ-সময় নিখিলের চোখ থেকে তার বেদনায় টপ টপ করে জল পড়ার কথা। সে নিজে ত একটুকুতেই কেঁদে ফেলে। শরীরের শিরা উপশিরাগুলিও বোধ হয় ঈশ্বর পুরুষ মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করেই নারীর তৈরি করেছে। আসলে ঈশ্বর নিজেও একজন পুরুষ মানুষ এবং বেইমান। পুরুষের ইতরামির সব দায় বহন করার ভারও সেজন্য নারীর উপর তিনি চাপিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরই পরম প্রতারক এমন মনে হল তার।

তারপরই মনে হল, আসলে সে নিজে সুবিধামতো সব ভাবতে চায়। নিরুপম যখন তাকে সঙ্গ দিচ্ছিল, তখন মনে হয়েছে, একটা মুক্ত বিহঙ্গ সে। খুশিমতো নিরুপমকে চেটে চেটে খেয়েছে। খাঁচার

পাখির মতো নিজেকে যৌনলিপ্সায় বন্দী করে রাখেনি। মনে হয়েছে, ঈশ্বর প্রদত্ত এই জীবনে ভোগই সম্বল। এমন সুসময় নারীর কবে আর আসবে। বাতাসের মতো যা শুধু বয়ে যায়—ফিরে আসে না—সুযোগ অবহেলায় নষ্ট করতে নেই। সে জানু গেড়ে সম্ভোগ করতে চেয়েছে নিরুপমকে। ফলে কোথাও যৌন স্বাদের হজমের বিষয়ে কোন টোট্‌কার সাহায্য নিতে ইচ্ছে হয়নি। মনে হয়েছে জীবন যতদূর বয়ে যায় সবটাই ভাটিতে। কুয়াশার মতো বীজের উন্মেষ হলে সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে দেয় সে জানত না। তার মৃত্যু ইচ্ছা পর্যন্ত হয়েছিল।

নিখিলবাবুকে সোনালী বলতে পারত, শরীরে ইচ্ছার ঘরে আমরা বাদী নিখিলবাবু। মা হয়েছি বলে লজ্জা নেই। লজ্জা, একজন যা সতী সাধ্বীর মতো পেটে ধারণ করেছিল, অন্যজন সমাজের হাস্যকর গোঁয়ার্তুমির ভয়ে সরে দাঁড়াল। দুঃখটা সেইখানেই। আমার মরতে ইচ্ছে হয়েছিল আপনাদের প্রতি ঘৃণাবোধ থেকে। আবার বাঁচতে ইচ্ছেও এইজন্য সে আমার পেটে রয়েছে। নারীত্বের বিপ্লব এখন আমার কাছে আরও হাস্যকর ঠেকে। একজন বপন করে যায়, অন্যজন বহন করে বেড়ায়। এই বহন করা যখন সৃষ্ট তখন আপনারাও আমাদের নতজানু হতে শেখাবেনই। বুঝেছি, আমাদের আত্মসমর্পণই একমাত্র গতি।

ডাইনিং হলে তিনজন একসঙ্গে ঢুকল না। প্রথমে দেখা গেল সোনালীর বাবাকে। তিনি ঘরে ঢুকে চিনেমাটির ঢাকনা খুলে কি দেখলেন। অর্থাৎ আজকার মেনু ঠিক ফলো করা হয়েছে কিনা, এবং যেখানে যা রাখার সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখলেন। এগুলো নিয়ে তিনি কখনই মাথা ঘামান না। সোনালীর মা চলে যাবার পর কেউ এ-বাড়িতে নিমন্ত্রিত হলে সোনালীই সব দেখে থাকত। কিন্তু আজ তার কেন জানি মনে হয়েছে সোনালীও এ-বাড়ির আর একজন অতিথি। তার ভাবনার সঙ্গে সোনালীর জীবন যাপন খাপ খায়নি। তিনি ভেবেছিলেন, সোনালী তার চিরদিনকার আত্মজা। সোনালীর

মাকে হারিয়ে মেয়ের মধ্যে এক ভাবালু দার্শনিকের মতো নির্ভরতা খুঁজেছিলেন। ফলে মনেই হয়নি সোনালীর আর অন্য কিছু অস্তিত্ব আছে। তাঁর সুখ সোনালীর সুখ, তাঁর দুঃখ সোনালীর দুঃখ। এসময় ঠোটে সামান্য বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটে উঠল তাঁর। আসলে সারাটা জীবন ভালবাসার কাঙ্গাল তিনি। কেউ ভালবাসলে বড় তিনি ছেলেমানুষ হয়ে যান। সোনালীর কোন ইচ্ছাই তিনি অপূরণ রাখেননি। ঠিক একজন ছেলের মতো বড় করে তুলেছিলেন। বিষয় সম্পত্তির অভাব রাখেননি। এবং পছন্দমত একজন যুবকের খোঁজে ছিলেন— সোনালীর পক্ষে যিনি খুবই দরকারী। কিন্তু সোনালী তার মর্যাদা দেয়নি। চাপা অভিমান বুক বেয়ে উঠছে। নিখিল ছেলে ভাল, তবে কোথায় যেন মনে ধরছে না। তার উপরে সেই যে বলে না যতই তুমি বাবা, আজকের মানুষ নিজেকে জাহির করতে চাও, কোথায় যেন কে তোমার পেছনে সব টেনে রেখেছে। ঠিক বাবার মতো যা পাবার সেখান থেকে আজ বঞ্চিত তুমি। এই অভিমানে তিনি একসময় বেল টিপতেই সহদেব হাজির। প্রাথমিক তদন্তের পর খবর দেওয়া যেন, সব ঠিক আছে। ওদের বল খাবার দেওয়া হয়েছে।

সোনালী ঢুকল আগে। সে সারা শরীর ঠিক আগের মতোই ঢেকে রেখেছে। এমনকি পায়ের পাতা পর্যন্ত শাড়িতে ঢাকা। শাড়ির আঁচল দিয়ে শরীর। খুব ধীরপায়ে সে ঢুকে এক কোণায় মাথা নিচু করে বসে পড়ল।

পরে আসছে নিখিল। চেককাটা ট্রাউজার। সাদা টেরিউলের সার্ট। একটু শীত শীত বোধ হয় তারও করছে। কারণ কালটা হেমন্তের শেষাশেষি। বেশ মাথা উঁচু করে নাটকের পাত্রপক্ষ ঢুকছেন। মেজাজী মানুষের মতো হাবভাব। সে জানে কিছুক্ষণের মধ্যে এই পরিবারের সব অহংকার ঝড়ো হাওয়ায় একটা লম্ফ নিভে যাবার মতো অবস্থায় পড়বে। সে একজন আলাদা ঘরানার মানুষ, এটাই তার সম্বল। তার বৈভব নেই কিন্তু সেখানে ফুলের বাগান আছে। বাবার জন্য ঠাকুরঘর আছে। যার জন্য শাক শুক্তোনি রান্নার ব্যবস্থা আছে। আর আছে

সামনে অদিগন্ত মাঠ, অর্জুন গাছ এবং স্বচ্ছ একটি পুকুর। ডুব দিলে, সব জ্বালা নিবারণ হয়। সে-জন্য তার চোখে মুখে এক ধরনের দীপ্তি ফুটে বের হচ্ছে। তার একটাই অপরাধ সোনালীর বাবাকে, রাস্তায় সোনালী যা-সব কাণ্ড করেছিল তা বলেনি। সে-জন্য সে মোটামুটি জবাব ঠিকও করে রেখেছে। সোনালীর বাবার অভিযোগের উত্তরে শুধু বলবে, আমার ইচ্ছে ছিল না, এ-সব বলে সোনালীকে ছোট করি। আসলে সারাদিন ধরে এই একটা কথাই ভেবেছে। অর্থাৎ রিহার্সেল দিয়েছে। এমন একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তার যে নার্ভ গণ্ডগোল করছে সেটা আদপেই স্বীকার করতে চাইছে না। এ-বাড়িতে ঢোকা থেকে এখন পর্যন্ত ঠিকই চালিয়ে যেতে পারছে। সোনালী বার বার বলেছে, বাবা খারাপ ব্যবহার করলে আপনি কিন্তু কিছু মনে করবেন না। বাবা আসলে ভিতরে ঠিকঠাক নেই। সারাটা দিনই বড় চঞ্চল ছিলেন। অবশ্য তার কাজকর্ম সবই নিখুঁত। অন্য দশটা দিনের মতো তিনি তাঁর অফিসে বসেছেন। লোকজন এলে পরামর্শ দিয়েছেন। বাড়ির ভিতরে যে চরম অবমাননার বিষয় ঘটে গেছে তা তাঁকে দেখে ধরা মুশকিল। ভয় সারাদিন পব না তিনি ভেঙ্গে পড়েন। ভেতবের সব হাহাকার না চিৎকার চেঁচামেচিতে ফুটে বেব হয়।

সেই ভয় থেকে, সোনালী নিখিলকে স্টাডিওতে অনর্গল সব পুঁথি-পাঠের মতো কি সব মুখস্ত বলে গেছে। তা নিখিল গ্রাহ্য করেনি। এখনও সে সবকিছু অগ্রাহ্য করবে এমন এক দৃপ্তভঙ্গিতেই ঘরে ঢুকে বলল, এ কি, এ-ভাবে বসে আছ কেন সোনালী! সোনালীর বাবার দিকে তাকিয়ে বুঝল, তিনি অসম্ভব রকমের পা দোলাচ্ছেন। হাতের চুরুট নিভে গেছে। সে তাঁর সামনে গিয়ে বসল। সোনালীকে ডেকে বলল, কাছে এসে বস।

সোনালী ঠিক তেমনি খুব ধীরপায়ে সামনে এসে বসল।

নিখিল দেখল সবাই চুপচাপ। আসলে এটা খাওয়ার নিমন্ত্রণ না আদালতে সে হাজির বুঝতে পারছে না।

সোনালীর বাবা চারপাশটা এবার ভাল করে দেখলেন। দরজা ভেজানো। বাইরে বয়, বেয়ারা হুকুম তামিল করার জন্য অপেক্ষা করছে। দরজা জানালা জুড়ে সব বড় বড় পর্দা হাওয়ায় ওড়াউড়ি করছে। এক ঝলক হাওয়া এসে সোনালীর ক্রিমচুলে পর্যন্ত সামান্য বিলি কেটে গেল। সোনালী উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বোধ হয় ভাল করে দাঁড়াতে পারছে না। তবু কাঁপা হাতে বাবাকে এবং নিখিলকে সার্ভ করার জন্য চিনেমাটির থালায় ফ্রাইড রাইস রাখতে গেলে বাবা বললেন, আমাকে সামান্য দেবে।

নিখিল বলল, আমাকেও।

বাবা বললেন, তালে না খেলেই ভাল।

—না না আপনি রাগ করবেন না। রাতে খুব কম খাই।

—সবাই তাই। তবে তোমাদের পক্ষে এ-বয়সে খাওয়াটাই সব।

—তা অবশ্য সব।

সোনালীর হাত কাঁপছিল।

তিনি বললেন, রুটি খাও রাতে?

—সাদা ভাত হলে ভাল হয়।

সোনালী সাদা-ভাত তুলে দিল। বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি?

—নিখিল যখন সাদা ভাত খাচ্ছে, আমাকেও তাই দাও। মাছ-ভাত খাব। সামান্য পুডিং, ব্যস। নিখিল, তোমাকে কিন্তু সব খেতে হবে। আমি নিজে আজ কিচেনে ছিলাম।

আসলে বাবা সব কিছু লঘু করে দেবার জন্য মিছে কথা বললেন। তিনি কিচেনে এক আধবার খোঁজ খবর করতে যেতে পারেন, এর চেয়ে বেশী কিছু না। যাই হোক সে বাবার এমন কথায় কিছুটা বেশী সাহস পেল। সে বলল, তোমরা কেউ কিছু না খেলে এত করা কেন!

—সেই।

বাবা সামান্য ভাজা দিয়ে আজ হাতে ভাত মেখে খেলেন। কাঁটা চামচ ধরলেন না।

নিখিল এ-বিষয়ে বেয়াড়া ধরনের—সে যেখানে যত বড় রাশভারি

খানাই হোক, নিজের হাতে না খেতে পারলে তৃপ্তি পায় না। সোনালী নিজের জন্য প্রায় কিছুই নিল না। একটা ফিশ ফ্রাই নিয়ে কিছু খাচ্ছে এমন একটা অভিনয়ের মুখ নিয়ে হাত নাড়াচাড়া করতে থাকল।

সোনালীর বাবা হঠাৎ কেসে উঠলেন। বিষম লেগেছে। নিখিল পরম আত্মীয়ের মতো বলল, জল খান। বলে সে উঠে জলের গ্লাসটা আর একটু এগিয়ে দিল।

বিষম সামলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মুখ ধুয়ে এলেন বেসিনে। মুখ মুছলেন। ভেতরে একটা ঝড় বইছে বুঝতে দিতে চান না। ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা খাও। রান্না ভাল হয়নি।

সোনালী ঠিক এ-সময়েই বলল, বাবা, তুমি আমাকে নিয়ে কষ্ট পাচ্ছ। আমার বোধহয় এখানে না থাকাই ভাল।

নিখিল বোকার মতো বলল, আসলে ভুল মানুষেরই হয় মেসোমশাই। আপনি অযথা কষ্ট পাবেন না।

এই প্রথম নিখিল সোনালীর বাবাকে মেসোমশাই বলল। নিখিলের কথায় ভারি আন্তরিকতা ছিল। কিন্তু এই যুবকই তাঁর আত্মজাকে গর্ভবতী করেছে ভাবতেই কান গরম হয়ে উঠল। তাঁর সামনের গ্লাস ছুড়ে মারতে ইচ্ছে হচ্ছিল মুখে। লম্পট কথাটা মুখে এসেও গেছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সব রাগ অভিমান চেপে রাখার এতই তাঁর প্রবল স্বভাব যে, তিনি হেসে ফেললেন। এবং নিখুঁত হাসি। তিনি একজন স্কাউণ্ড্রেলের জন্য নিজে কিচেনে তদারকি করেছেন ভাবতেও ঘেন্না হচ্ছিল। তবু হাসতে হয়। যেন কিছুই এমন ঘটনা নয়। নিজেকে এ-জন্য কতটা যে সংযত রাখতে হয়েছে—তা তার মাথার পেছনের ব্যথাটা বাড়াতেই টের পাচ্ছেন। শুধু একবার বাইরে লাল আলোর সংকেত জানিয়ে বললেন, তোমরা খাও। ওষুধ খেতে ভুলে গেছি। এ-বয়সে একটা হাসি কাঁসিই মারাত্মক। আমার জন্য তোমরা বসে আছ কেন।

সহদেব এলে বললেন, ওষুধ নিয়ে আয়।

সোনালী জানে, বাবার ব্লাড প্রেসার বেড়েছে। এবং যখন বাড়ে

বাবা ঠিক টের পান। সে নিজেই উঠে গেলে বাবা বললেন, আহা; তুমি আবার যাচ্ছ কেন। ওরাই ত এখন থেকে সব করবে। তারপরই নিখিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, জান নিখিল, মানুষ সারাজীবন একদম নিজের কাউকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কে কতটা পায় এ-বিষয়ে আমার সংশয় আছে। বুড়ো বয়সে একজন নিজের কেউ না থাকলে খুব অসহায় লাগে।

সোনালী সহসা কেমন আর্তনাদ করে উঠল, বাবা।

নিখিল দেখল সোনালী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ কেমন উদাস।

তিনি ফের বললেন, সত্যি ত আমি, মানে ইট ইজ ট্রু—আই মিন, কি যেন বলতে চাই। নিখিল আমি কি বলতে চাই তুমি বলতে পার?

নিখিল অবাক হয়ে বলল, আমি কি করে বলব!

—সোনালী কাঁদছে কেন!

—সেইত! আমরা পুরুষেরা মেয়েদের জন্য একটা জগৎ তৈরি করে দিয়েছি। তার বাইরে গেলেই যত বিপদ। ডেনজার। এটা যদি স্বাভাবিক ভেবে নি, তবে বোধ হয় এত আমাদের কষ্ট পেতে হয় না।

—তুমি কি বলতে চাও নিখিল!

—বলছি আপনি আমাকে আজ কেন ডেকেছেন তা আমি জানি।

—কেন ডেকেছি বল, কেন আমি জবাব খুঁজে পাচ্ছি না বল।

—আপনি সোনালীর বিপদের কথাটা আমাকে জানাতে চান।

—সোনালীর বিপদ! তোমার বিপদ নয়?

—আমার? আমার হবে কেন!

—তুমি বলছ তোমার বিপদ নয়? ঠিক বলছ!

তখনই নিখিল দেখতে পেল, এক তুষারপাত ঘটছে। পুরুষদের জন্য নরম কাচের বাড়ি, এবং উত্তাপ, ও খাদ্যসামগ্রী। নারী তুষারপাতে দাঁড়িয়ে পুরুষের সেই আহার দেখছে। এবং কত যুগ ধরে এই হয়ে আসছে। নারীর প্রতি পুরুষের এই অবমাননা কেন জানি তার আজ

নিজের অপরাধ বলে ভাবতে ভাল লাগল, সে বলল, হ্যাঁ আমরাই দায়ী। নিখিল সমস্ত পুরুষের হয়ে যেন দায়ের কথাটা স্বীকার করল।

—দেন ইট ইজ সেটল্ড। দেন ইট ইজ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার। এবং ফলটাও তোমার জানা। আমি তোমার বাবাকে সব জানিয়ে চিঠি দিতে চাই। কারণ আজ থেকে সোনালী আর আমার নয়, তোমাদের।

নিখিল বলল, বাবার কথা কেন বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। নিখিল কিছুটা হতভম্ব। বাবাকে সোনালীর বাবা কি জানাতে চান, কোন্ বিষয়ে, বিয়ের জন্য? সোনালী কি তার ইচ্ছের কথা জানিয়ে দিয়েছে? কিন্তু সেই মহামরণ যার কামড়ে, সোনালীর বাবা অস্থির তার কি হবে? আর এখনই কেন! সে যথেষ্ট উদার, সব জেনেও সোনালীকে গ্রহণ করার মধ্যে কোন উদাসীনতা বোধ করে না।

সোনালীর বাবা উঠে দাঁড়ালেন ফের। পায়চারি করতে থাকলেন। নিখিল তাঁর খাওয়ার কথা ভুলে গেছে। সোনালী উঠে চলে যাচ্ছিল, মেসোমশাই বললেন, কোথায় যাচ্ছ? কিছুই খেলে না দেখছি।

সোনালী ফের এসে বসে পড়ল। তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। বিষয়টা যে এত গভীরে, আগে যদি বুঝত। সে ক্রমশঃই কেমন অসহায় হয়ে পড়ছে। নিখিলবাবু জানেই না, নিরুপমের জায়গায় সে বসে আছে। বাবা যে কোন মুহূর্তে সেই বসার জায়গাটা আঙ্গুল তুলে দেখাতে পারেন। বলতে পারেন, তুমি সোনালীর সর্বনাশ করেছ ছোকরা। এখন আমি দরকার হলে আইন আদালতের সাহায্য নেব।

কিন্তু বাবা কেমন একেবারে অন্যরকমের মানুষ হয়ে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, নিখিল, তোমাব বাবাকে জানানো দরকার। তোমরা আমাদের উভয়েরই জাতক। সোনালী এবং তোমার পক্ষে তাঁর আশীর্বাদ বাঞ্ছনীয়।

নিখিল বুঝতে পারছে বিষয়টা অনেক দূর গড়িয়েছে। সোনালীকে গ্রহণের পক্ষে নিখিলের কোন দ্বিধা নেই তাও তিনি জেনে ফেলেছেন।

কিন্তু রমণী আগুন জ্বালিয়ে বসে আছে—সেই আগুনের আঁচ তার বাবার আশ্রমের মতো সংসারকে ছারখার করে দিতে পারে। সে নিজেও এবার খুব অসহায় বোধ করল। বলল, বাবাকে এক্ষুণি জানিয়ে লাভ নেই।

এবারে সোনালীর বাবা প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন, কি বলছ! জানিয়ে লাভ নেই!

—না।

—কোন লাভ নেই। আমি জানব, তোমার বাবা জানবে না!

সোনালী হঠাৎ হু হু করে কেঁদেছিল, বাবা আমাকে নিয়ে কেন এত ভাবছ! যে এসে গেছে বাবা, আমি তার। আমি তোমাদের কারো না। আমি তার। তোমরা······তোমরা এই নিয়ে—না বাবা, আমি চাই না। বাবা, নিখিলবাবুর কোন দোষ নেই। সব আমার দায়। বলে সে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল, তারপর হেঁটে চলে গেল।

নিখিল নারীর এমন সৌন্দর্য আর কোনকালে নিরীক্ষণ করেনি। পৃথিবীতে এত পবিত্র কোন নারী থাকতে পারে সোনালীর চলে যাওয়া না দেখলে টের পাওয়া যেত না। তার মাও এভাবে একদিন তাকে গর্ভে নিয়ে হেঁটে গেছে। জন্মের পর আর কি থাকে! সে কার, তার পিতৃপরিচয় সঠিক কি, পৃথিবীর কোন্ মানুষ আছে হলপ করে বলতে পারে—এ আমার জাতক। নারীর এমন সৌন্দর্য সে এই প্রথম গভীর স্নেহ এবং মমতায় অনুধাবন করে মাথা নিচু করে বসে থাকল।

সে এখন কোন দৈববাণীর মতো শুনে যাচ্ছে।

'তোমাদের বিয়ে ঠিক।

আমি এ-মাসেই কাজ সেরে ফেলব।

তোমার বাবাকে চিঠি দিচ্ছি।

তিনি আসবেন। আমি চাই তিনি আশীর্বাদ করুন।'

নিখিল উঠে দাঁড়ালে তিনি ফের বললেন, তোমার বাড়ির ঠিকানাটা!

নিখিল তার বাবার ঠিকানা দেবার সময় শুধু বলল, এ সব নিয়ম-কানুনে না গেলেও হত। বাবা রাজী হবেন না।

—কেন? আমার মেয়ে কি তার ছেলের পক্ষে উপযুক্ত নয়?

—না, সে কথা নয়। বাবা সোনালীকে দেখলেই টের পাবেন।

—নিখিল, তুমি ভাবছ, তুমি অমানুষ বলে তোমার বাবাও অমানুষ হবেন!

নিখিল আর পারল না, আমি অমানুষ! আমি অমানুষ!

সোনালীর বাবা দেখছে, নিখিলের চোখ কেমন গোল গোল হয়ে গেছে। পাগলের মতো! তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে নিখিলের দু'হাত জড়ো করে নিজের হাতে তুলে নিলেন। বললেন, তুমি রাগ কর না নিখিল। বুঝতেই পারছ, আমার মাথা ঠিক নেই। কি বলতে কি বলে ফেলেছি।

দরজার ওপাশ থেকে কেউ হেঁটে আসছে তখন। ওরা দু'জনই দেখল, সোনালী হেঁটে আসছে। খুব সহজভাবে হেঁটে আসছে। কাছে এসে দু'জনের দিকেই সে তাকাল। তারপর সে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা?

—কিছু বলবে?

—বাবা, আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

—তার মানে?

—আমি এখন কাউকে বিয়ে করতে পারব না।

—সোনালী!

—হ্যাঁ বাবা। আমি চাই যে আসছে সে আসুক। তাকে নিয়ে আমি সবার সামনে শক্ত পায়ে হেঁটে যেতে চাই।

নিখিল এ-মুহূর্তে সোনালীকে কি বলবে ঠিক করে উঠতে পারল না। সে শুধু বলল, একজন অমানুষের সঙ্গে আপনি তাকে লটকে দিতে চান, সোনালী তা মানবে কেন!

—না না, নিখিলবাবু, আপনি নিজেকে এত ছোট ভাববেন না। আমি আপনাকে……আমি কি বলব বাবা, ওকে কেন……

—সোনালী!

—বাবা।

—নিখিল তোমার বন্ধু নয় ?

—না বাবা !

—তবে সে কে ?

—তিনি রাস্তায় আমাকে বাঁচিয়েছিলেন।

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! হি ইজ নট ইয়োর ফ্রেণ্ড! হি ইজ অ্যান স্ট্রেনজার! সে তোমার কেউ নয়—তবে এটা কার ?

—ওকে তুমি অপমান করতে পার না বাবা !

—নিখিলকে বলছ ?

—না না, যে আসছে! তাকে তুমি অপমান করতে পার না। সে আমার যীশু। হি ইজ ফেমাস ক্রাইস্ট। তাঁকে অপমান করলে সব মানুষকে অপমান করা হয়। হি ইজ দ্য প্লেজার। দ্য ডিভাইন অ্যাকজিস্টেনস। এটা কার, এমন বললে আমরা কার এ প্রশ্নটাও করতে হয় বাবা !

যেন এটুকু বলার জন্যই সোনালী ফিরে এসেছিল। সে আবার ফিরে যাচ্ছে। নিখিল ডেকে বলতে পারল না, সোনালী, থাম। আমার অনেক কথা এখনও বাকি। আমি জানি হি ইজ দ্য প্লেজার। আমি জানি, মানুষের ঘর বাড়ি সব কিছু এই প্লেজারকে কেন্দ্র করে। তবু আরও কিছু থেকে যায়। থেকে যায় এ-জন্য যে তার একটা সামাজিক অস্তিত্ব দবকার। একটা খোঁটা পোতা থাকে। দড়িতে বাঁধা অস্তিত্ব সেই খোঁটার চারপাশে পাক খায়। এবং সে নিজের কেন্দ্রভূমিতে বাস করে বলে জীবনের চাবপাশ ফুলে ফলে ভরা থাকে। যদিও কৃত্রিম এই ফাঁস, তবু তাকে এটা গলায় পরতে হয়। মৃত্যু জেনেও যেমন মানুষ বেঁচে থাকতে ভালবাসে, এও তেমনি। একে তুমি অবহেলা করলে আজীবন লাঞ্ছনা বয়ে বেড়াবে।

সোনালীর বাবা কেমন স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। নাড়ী ধরে টান দিলে যা হয়। এ সময় তাঁর কেন জানি না ভানুকাকা বলে এক ব্যক্তির মুখ মনে পড়ল। বাড়িতে আশ্রিত মানুষটিকে বাবা বড় ভয় পেতেন: মা'র কাছে আজ কেন জানি একবার গিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে

হল প্রকৃত অর্থে ভানুকাকা তার কে হয়। সে তো ভানুকাকার মতো দেখতে।

অথচ তিনি জানেন, মা এখন হয়ত তার মন্দিরে বসে আছেন। কাঁসি-ঘণ্টা বাজছে, ধূপ-দীপ জ্বলছে। কুশাসনের ওপর বসে মা আহ্নিক করছেন এবং ধর্মগত প্রাণ—রামায়ণ মহাভারত ও গীতার শ্লোক কেউ যেন অবিরাম পাঠ করে যাচ্ছে। সংসারে বেঁচে থাকার জন্য এ-সবের দরকার হয় কেন! পৃথিবীতে কি সবারই তবে কনফেস করার প্রয়োন আছে। মা বোধ হয় শেষ জীবনে সারাক্ষণ লৌকিক আচারের মধ্যে সেই কনফেসনে ব্যস্ত আছেন। এবং তখনই তিনি নিখিলকে বললেন, বয়, অধীর হবে না। আমি বুঝেছি সোনালী তোমার এখন বুকের মধ্যে দাপাদাপি করছে। তুমিও কম কষ্ট পাচ্ছ না। আমাব সঙ্গে এস।

যেন নির্দেশ। অমোঘ নির্দেশ। সে উঠে পড়ল। পেছনে পেছনে যাচ্ছে। আজ বোধহয় কারো আর আহার করা হল না। সেদিকে কারো চোখও নেই। যেতে যেতে তিনি বললেন, সোনালীকে বাঁচিয়েছিলে!

—না, তেমন কিছু না।

— তবে সে যে বলল·····

নিখিল চুপ করে থাকল।

—সোনালীর সঙ্গে কোথায় আলাপ?

—দূরপাল্লার বাসে!

—কোথায় যাচ্ছিলে?

—বহরমপুর।

—সোনালী?

—গাড়িতে বসে সোনেরিল খাচ্ছিল গোপনে. এবং যেতে যেতে সব বললে, কেন জানি নিখিলকে মনে হল পারিবারিক বন্ধু এবং সোনালীর সব। তিনি বললেন, বাড়িটা সব ঘুরে দেখেছ?

—না।

—আমার মা'র সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

—না।

—এদিক দিয়ে এস। দরজা বন্ধ করতে হবে না। তুমি এদিকটায় তবে আসনি ?

—না।

—আমার মা এখন পূজো-আর্চা নিয়ে আছেন। কোন আষটে গন্ধই তিনি সহ্য করতে পারেন না।

নিখিল এদিকটায় এসেই বুঝল, কেমন এক পবিত্র সুগন্ধ। ধূপ-দীপ জ্বললে, অথবা বাবার ঠাকুর ঘরে ফুল বেলপাতা অথবা চন্দনের গন্ধ নাকে লাগার মতো।

—আমার মা নিচে নামলে, সারা বাড়িতে গঙ্গাজল ছিটাতে হয়।

—সব বাড়িটা তবে তাঁর কাছে অপবিত্র।

—মা'র এই ধারণা। তিনি ভেবেছেন, আমরা ম্লেচ্ছ হয়ে গেছি। তুমি অবশ্যই বলতে পার, সোনালীর মা'র কথা।

—সোনালী সব বলেছে।

—মানুষের কেন এটা হয় ?

—আমি ঠিক জানি না।

—আসলে নিখিল, আমরা কেউ কিছু জানি না। এক নিয়তি ছাড়া। যা কিছু ঘটে সবই সে। এও আমার প্রাপ্য ছিল। সোনালীরও এটা নিয়তি। বয়স যত বাড়ছে তত বুঝছি, কোন কিছুই ধরে রাখা যায় না। তবু খুঁটি পুঁততে হয়, ঘর বানাতে হয়।

এদিকটায় করিডোরের দু-পাশের দেয়ালে সব সাধু-সন্তদের ছবি। বামাক্ষেপা থেকে রামকৃষ্ণ। এখানে কোন কার্পেট পাতা নেই। বয়সে ভারি একজন বৌ দাঁড়িয়ে। বাড়ির মালিক আসছেন। তাঁকে দেখে সে ঘোমটা টেনে একপাশে সরে দাঁড়াল। তিনি ঘড়ি দেখলেন। ছাদের ও-পাশটায় মন্দিরের মতো মা'র জন্য পূজার ঘর করে দেওয়া আছে। বোধহয় মা এখনও সেখানেই আছেন। সংসারে অপদেবতারা দাপাদাপি করে বেড়ালে তিনি কেমন গন্ধ শুঁকে টের পান। তখন তাঁর পূজা-আর্চা আহ্নিকের সময় বেড়ে যায়। মা'র বসার ঘরে একটা স্তিমিত আলো

জ্বালা। শোবার ঘর বন্ধ। এই সব দেখে তিনি বললেন, মা এখনও পূজার ঘরেই আছেন। তবে কি মা সোনালীর এই বিপর্যস্ত অবস্থার কথা টের পেয়ে গেছেন? যেমন তিনি টের পেয়েছিলেন, সোনালীর মা আর ভাল নেই। মাঝে মাঝে শুধু বলতেন, তুমি এত কাজ পাগলা মানুষ কেন? বৌমা কোথায় যায়! তোমাদের বাবা যে কি হয়েছে বুঝি না। সব সময় কেমন বুকে তাঁর শঙ্কা জেগেই থাকত।

ছাদে কত সব ফুলের গাছ। দোপাটি ফুল এখনও দুটো একটা ফুটে আছে। জ্যোৎস্না রাতে নিখিলের সবই কেমন এ-বাড়ির রহস্যময় লাগছে। এত বড় বাড়ি, অথচ মানুষ-জনের সাড়া শব্দ নেই। গ্রীনভেলি থেকে ঝাউ গাছের শনশন শব্দ ভেসে আসছে। পাশের বাড়িটায় বোধহয় টিভি চলছে। ইংরাজি নাটকের কিছু সংলাপ থেকে থেকে কানে আসছিল। তখনই পূজার ঘরের দরজা কেউ খুলছেন। সাদা গরদ পরনে নামাবলী গায়ে এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে।—কে রে? মানিক?

—হ্যাঁ মা। বলেই গড় হলেন তিনি।

এক বাড়িতে অথচ নিখিল টের পেল সোনালীর বাবা এদিকটায় বড় আসেনই না। যেন কতদিন পর মাতা পুত্রের দেখা। এবং প্রবাস থেকে ফিরে এলে যেমন কথাবার্তা হয় তেমনি কথাবার্তা দু'জনে।—তোর শরীর কেমন?

—ভাল মা।

—না ভাল নেই। তোমার মুখ দেখলে টের পাই সব।

সোনালীর বাবা কিছুটা অন্যমনস্কের মতো দাঁড়িয়ে কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

—তোর সঙ্গে কে?

নিখিলও তাড়াতাড়ি প্রণাম করে ফেলল। বলল, আমি নিখিল। আর কি পরিচয় দেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

নিখিল দেখল এক অতিকায় ছবি ঠাকুরের সিংহাসনে। সোমনাথ ব্রহ্মচারী হাঁটু মুড়ে ছবিতে বসে আছেন। আর কোন ঠাকুর দেবতার ছবি নেই। শ্বেত পাথরের মেঝে, তামার টাট, পেতলের কমণ্ডুল, তামার

পাত্রে চরণামৃত। তাতে ফুল ভিজিয়ে কিছুটা ওদের শরীরে ছিটিয়ে দিয়ে দু'জনকেই যেন পবিত্র করে নিলেন। কিছুটা নিজের গায়েও ছিটালেন। এই পবিত্রতা সোনালীর পিতামহীকে কিঞ্চিৎ যেন সাহসী করে তুলল, এস, ভিতরে এসে বোস।

ভিতর বলতে কোথায় নিখিল বুঝতে পারল না। এই পূজার ঘরে না অন্যত্র। সে দাঁড়িয়ে থাকল।

—মানিক ছেলেটিকে তুই কোথায় পেলি!

এমন কথায় সোনালীর বাবা কিছুটা চমকে উঠলেন।

—এ কথা কেন মা!

—ওর এ বাড়িতে আসা ঠিক হয়নি। পিতামহী ফের বললেন, তোরা আয়। বলে তিনি ছাদের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে থাকলেন। পায়ে কাঠের পাউটি! খটাস খটাস শব্দ উঠছে। এতক্ষণ নিখিল এটা লক্ষ্যই করেনি। করিডোরে ওরা জুতো খুলে এসেছে। ওদের দু'জনেরই খালি পা। সোনালীর বাবা, মা'র কিছু বাতিক আছে এমন বুঝিয়ে তাকে জুতো খোলার জন্য বলেছিলেন। যে ঘরটায় নিয়ে গেল, সেটা ঠিক বসার ঘর নয়। ঘরে সে দেখল, খোল এবং করতাল। বোধহয় এ বাড়িতে আর এক রকমের জীবন এখানটায় বেঁচে আছে। বোধহয় পূর্ণিমায় লোকনাথের উৎসব হয়। সারাদিন কীর্তন গীতাপাঠ এ সব থাকে! পরকালের জন্য তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম এখন।

গোটা ঘর জলচৌকি, এবং কাঠের তক্তপোষে মাদুর পাতা। সোনালীর বাবা বললেন, শীত আসছে মা। তুমি কেন যে অযথা কষ্ট পাচ্ছ।

শীতের কথায় নিখিল বুঝল হেমন্তের পরই শীত। শীতকালে তিনি কি এই মাদুরে শয়ন করেন! প্রাচুর্যের মধ্যেও দৈন্যদশায় থেকে তিনি কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান! সে বলল, ঠাকুমা, এটাই আপনার থাকার ঘর?

—হ্যাঁ তাই। এটাতেই আমার সব। এখানেই থাকি। দেয়ালে একখানা ফটো। যে মানুষের জাতক সোনালীর বাবা, তাঁর। না কি অন্য কারও। ফটোর সঙ্গে বড় মিল সোনালীর বাবার।

মানুষ তাহলে শেষ পর্যন্ত কি চায়! সারাজীবন এই পিতামহী কি চেয়েছিলেন! পুত্রের প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদ কোনটার কমতি নেই। সোনালীর বাবা কোথা থেকে কোথায় উঠে এসেছেন সে জানে না। তবু এই বিশাল বাড়িঘরে হাঁটলে সে টের পায় একটা বড় রকমের হাহাকার আছে। এখানটায় এসে এই বাড়ির হাহাকার সে আরও বেশী টের পেল। এ সময় সে দেখল সেই বয়সা বউ-মত মহিলা কিছু প্রসাদ এবং গ্লাস জল রেখে গেল। সোনালীর বাবা মাথায় ঠেকিয়ে একখানা সন্দেশ খেলেন। নিখিল দেখাদেখি তাই করল। দেব-দ্বিজে ভক্তি-শ্রদ্ধা তার তেমন গড়ে ওঠেনি। বাড়িতে এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তার একটা মতান্তর আছে। তবু এই পুজো-আর্চায় কোথায় যে একটা পবিত্রতা থেকে যায়। সে সব কিছু ঠেলে ফেলে দিতে পারে না। ঠাকুরঘর ফুলের বাগান কাঁসি-ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে তার ভালই লাগে।

পিতামহী বসে আছেন তক্তপোষে। মাদুরের উপর পশমের আসন পাতা। নামাবলী খুললে নিখিল দেখতে পেল গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পুত্র এবং পৌত্রীর চেয়ে, তার জপতপ গঙ্গাজল বেশী প্রয়োজন এখন। তিনি কি জানেন, তাঁর বাড়িতে কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হয়ে আছে! কোথায় যেন গোটা পরিবেশটার সঙ্গে এই জপতপের বিষয়টা বেমানান। বুড়ো বয়সে সোনালী ঠিক একইভাবে বসে থাকতে পারে। এতক্ষণে টের পেল, সোনালীর মুখের মতোই পিতামহীর মুখ। পিতামহী কুমারী বয়সে আর এক সোনালী ছিল। আসলে নিখিল এখন এই বয়সী মহিলার মধ্যে সোনালীকেই দেখতে পাচ্ছে। বড় মাঠ হেঁটে পার হলে যখন মানুষের এই চেহারা হয়, তখন সে আর সোনালী থাকে না। সে পিতামহী হয়ে যায়। এরই মধ্যে তখন কূট কামড় মাথায়—এ বাড়িতে ছেলেটিকে এনে ভাল করনি। কি আশংকাতে পিতামহীর এমন ভয়? সে বলল, ঠাকুমা, আপনি কুমারী বয়সের কথা কিছু মনে করতে পারেন?

—পারব না কেন?

—আপনি এখন গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরবেন ভেবেছিলেন?

এমন প্রশ্নে সোনালীর বাবা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনি

নিখিলের দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছু বলতে পারছেন না, কারণ নিখিল কেন একথা বলছে তিনি বুঝতে পারছেন না।

পিতামহী বললেন, না, তখন ভাবিনি। তখন এই গাছপালা মানুষ-জন আমার কাছে অন্যরকম ছিল।

—এখন নেই ?

—আর কিছুর জন্য কোন টান বোধ করি না! তিনিই সব একসময় হরণ করে নেন। বলে কপালে অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানালেন।

নিখিল বলল, আমি এ-বাড়িতে আসায় আপনার কি কোন ভয়ের আশংকা ঘটেছে ?

—না না ভাই, তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি, এ-বাড়িতে তুমি বেমানান। এজন্যই ভয়।

সোনালীর বাবা বললেন, ছেলেটি খুব ভাল। সোনালীর অন্য বন্ধুদের মতো নয়।

তিনি বললেন, সেই। তারপর কি ভেবে বললেন, সোনালীর কি নাকি হয়েছে ?

সোনালীর বাবা নিজের প্রসন্নতার অভিনয় আর ধরে রাখতে পারলেন না। গম্ভীর হয়ে গেল মুখ। ভারি থমথমে। মাথা নিচু করে বললেন, শরীরটা ভাল না।

—ভাল থাকবে কি করে। কেবল ড্যাং ড্যাং করে ঘুরবে। সময়মত খাবে না। কি সব বসে বসে কেবল আঁকে। বিয়ে দিয়ে দাও। কত বলছি, এ বয়সে মেয়েদের আর কুমারী রাখা ঠিক না। শরীরে ঘা হয়।

নিখিল বলল, সবারই হয় ঠাকুমা!

—বিয়ে না দিলেই হবে। শরীর ত!

—বিয়ে দিলেই নিরাময় হয় ?

—নিরাময় হয় না। উপশম হয়।

নিখিল বৃদ্ধার এমন কথায় চোখ বুজে কিঞ্চিৎ কি ভাবল। নিরাময়

এবং উপশম, দুটো শব্দ অর্থে যতটা কাছাকাছি, বিষয়ের দিকে ততটা ফারাক। সোনালীর এটা উপশম না নিরাময় এ মুহূর্তে তা ঠিক করা গেল না। সোনালীর বাবা বললেন, উঠি মা। মাথায় আমার হাত রাখ একটু। ভরসা হারাচ্ছি।

সোনালী নিজের ঘরে বসে আছে। ঝড়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লতার মতো সে আড়ষ্ট। এখন কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। কেমন আচ্ছন্ন নিজের মধ্যে। সে সব কিছু নিশ্চিন্ত না জেনেও এক অমোঘ টানে ভেসে চলেছে। সামনের পৃথিবীটা কতটা রুদ্র হতে পারে সে তা বুঝেও বুঝতে চাইছে না। এক জগদ্দল নিথর অন্ধকার থেকে সে নারীর মুক্তি চাইছে। সে প্রায় বলতে গেলে একজন বিদ্রোহী নারী। বাবা, মা এবং ভালবাসার জন সব তার কাছে এখন অর্থহীন। যদিও জানে বাবা যতই মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করুক শেষ পর্যন্ত কি করবে তার জানা নেই। সে কি তবে পালাবে ? সেটা কোথায় ? নিখিলবাবু এবং বাবা এখন থেকে কেবল পরামর্শ করে চলবে। একজন চায় কাঁটা থেকে নারীকে মুক্ত করতে, অন্যজন যতই ওম্যান লিব সম্পর্কে উদার হোক, জাতকের ক্ষেত্রে তা কেমন যেন বেমানান। এত পশ্চিমের হাওয়া ঢুকিয়েও শেষ পর্যন্ত দরজা জানালা খোলা রাখতে পারছে না।

তাই সব চিন্তায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। তার নিজস্ব টি·ভিতে সে কতদিন কোন প্রোগ্রাম দেখে না। সাটার সেই যে বন্ধ করেছিল, আর খোলেনি। সব চেয়ে বেশী দরকার তার এখন স্বাভাবিক থাকা। স্বাভাবিক না থাকলে তার চিন্তার জটিল এলোমেলো ভাবনা সেই নবাগতকেও গ্রাস করবে। তার যেন কিছুই হয়নি, এমন ভাবে উঠে দাঁড়াল। আজ শুক্রবার। গুডিজ দেখা যেতে পারে। তার এখন প্রসন্ন থাকা দরকার। এই ভেবে সে টিভি চালাতেই দেখল গুডিজের শেষটুকু। একটা তিন-চাকার সাইকেলে তিনজন পুরুষ টুপি দুলিয়ে চলে যাচ্ছে। তার থামার অবসর মিলল না। সে নিরাশ হয়ে ফিরে আসছিল—তখনই ঘোষণা, একজন শ্রীমতী মিষ্টি হেসে বলছে, এর পর

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য। নাচ গান হল্লা এক জীবনে কতটা করা যায় সে জানে না। কিন্তু এই জীবনই তার যেন এতদিন সার ছিল। কিছুদিন থেকে অন্য জীবন। নৃত্যনাট্যের মধ্যে সে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি খোঁজার চেষ্টা করল।

সুদূর থেকে গানের কলি যেন ভেসে আসছে—'…পরাণ যাহা চায়'। সোনালী একটা মোড়ায় বসে আছে। সে দেখছে। নাচ-গান এবং মেয়েটির পোশাক তাকে বিদ্ধ করছিল। কোথাও মানুষ যেতে চায়। সেও রওনা হয়েছিল, মাঝপথে নিরুপম তাকে আটকে দিল। গান অথবা লেখা, কেউ করে রাজনীতি, কারো ইচ্ছে থাকে শিল্পী হবার— সবটার মধ্যেই আছে সেই পাবলিক বাহবা। মেয়েটির নাচের মুদ্রা এবং হাত পা সবই সেই ইচ্ছের কথা বলছে। আর কি থাকে—অপরিমিত লোভ, বাসনা কামনা। কামনা উদ্রেকে নিরুপম পটু। এবং পটু বলেই সে নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। নিখিল সেটা এখনও জানেই না। অথবা এজন্য যে রিহার্সেলের দরকার হয় তাও তার জানা নেই। সে মনে মনে বলল, হাবা কোথাকার। একদম স্মার্টনেস বিহীন। এবং তখনই মাথায় কে যেন টোকা মেরে গেল—এই! কি ভাবছ! তুমি নিজেই আগুন হয়ে জ্বলছিলে, নিরুপমের দোষ দিচ্ছ কেন? আসলে পরাণ যাহা চায়। এবং এই চাওয়াটুকু আছে বলেই জীবন অর্থহীন হয় না। সে কেমন আরো সাহস পেয়ে গেল। তার মনে আর কেন জানি কোন বিরূপতা নেই সে উঠে দাঁড়াল। কোন রেকর্ড চালিয়ে সে যেমন একাকী নাচতে ভালবাসত, আজও তার ভিতরটা নাচের জন্য নড়ে চড়ে উঠছে। সে হাত মেলে দিল এবং টিভির মেয়েটির চেয়েও বেশী সুন্দর করে নাচতে থাকল। পা ফাঁক করে, হাত মেলে সে যেন নিজেকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল। খেয়ালই নেই দরজা খোলা, পর্দা বাতাসে উড়ছে। এবং বাড়ির মাথার উপর দিয়ে একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে। কেমন সম্বিত হারিয়ে সোনালী নাচছিল। উদাস করা নাচ। দরজায় তখন থমকে দাঁড়িয়ে আছে সোনালীর বাবা, নিখিল। এই শরীর নিয়ে এমনভাবে কেউ নাচতে পারে তারা বিশ্বাসই করতে পারছিল না।

সোনালীর বাবা বললেন, তুমি ভয় পাচ্ছ নিখিল ?

নিখিল বলল, না। ভাবল সোনালী পাগল হয়ে যায়নি ত।

—তবে এস।

ওরা ভিতরে ঢুকে একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। যেন ওরা দু'জন দর্শক। গোপনে না, আবার সামনাসামনিও না। সোনালী টিভির সামনে। ওরা দেয়াল ঘেঁষে। সোনালীর নাচ শেষ হলে সোফায় এসে বসার সময় দেখল, বাবা নিখিল দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছিল। তার মধ্যেই বলল, ওমা তোমরা! কখন! যেন একেবারে সেই আগেকার সোনালী।

নিখিল বলল, তুমি এত ভাল নাচতে পার!

—ও যা! আপনি যাননি দেখছি! সোনালী সত্যি যেন ভারি লজ্জা পেয়েছে এমন করে মাথা নিচু করে সে বসে থাকল।

নিখিল সোনালীকে যত দেখছে অবাক হয়ে যাচ্ছে। এই মেয়ে পৃথিবী জয় করতে পারে। তাব স্বভাব, আচরণ, বুদ্ধি এবং প্রেম সবই বড় সজীব। শুধু একটা জায়গায় তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা রোধ করা সম্ভব হয়নি! না কি সে চায়নি! না চাইলে তার তো আরও সাহসী হওয়া দরকার ছিল। কিংবা তার তবে আত্মহত্যারও কোন কারণ থাকত না। তবে কি সোনালী যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে বলে মনে মনে তৈরি হচ্ছে সেটা তার আগে ছিল না? বাধা বিপত্তি তাকে নতুন করে দীপ্ত করছে। সে দীপ্ত কথাটাই ভাবল। এ ছাড়া সোনালীর আভরণে অন্য শব্দ মানায় না। সোনালীকে তার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে, সোনালী, তোমার এত রূপ এক অঙ্গে! তোমাকে নিয়ে কার সাধ্য সামলায়। তুমি বরং নিজের মতোই বাঁচ। আর তখনই হাহাকার বাজে। সোনালী তার অস্তিত্বে শেকড় ঢুকিয়ে দিয়েছে। সে সোনালীর সব কিছুকেই ভালবাসবে। তার জাতক সহ—কারণ আকাঙ্ক্ষাই মানুষের সব না। অথবা মেয়েদের তো ফুল হয়ে ফুটে থাকারই কথা। উড়ে এসে কেউ মধু খাবে, আবার চলে যাবে, আবার আসবে। একান্ত নিজস্ব করে কোনদিনই কাউকে ধরে রাখা যায় না।

তারপরই সোনালী সহসা বলে ফেলল, আজ আপনি এখানে থেকে যান না!

সোনালীর আচরণে নিখিল থৈ পাচ্ছে না। দরজা দিয়ে ঢোকার মুখে তার মনে হয়েছিল, সোনালী পাগল হয়ে যায়নি ত—কারণ খাবার টেবিলে এক রূপ, নিজের ঘরে সোনালীর অন্যরূপ। এখন মনে হচ্ছে, সোনালী তার পরিবারের মা বোনেদের মত। ভারি আন্তরিক কথাবার্তা। যেমন বাড়ি গেলে বোনেদের আবদার, আজকে থেকে যা দাদা, একটা দিনে কিছু হবে না। সোনালীও ঠিক তেমনি সহজভাবে বলছে, একটা ত রাত, থেকে যান না।

নিখিল সোনালীর বাবার দিকে তাকাল। তিনি কি বলেন! তার সায় আছে কি না!

সোনালীর বাবা সোফায় বসার সময় দেখলেন, নিখিল তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি বললেন, থেকে যাও। সোনালী যখন বলছে। অর্থাৎ এই সময় বোধহয় তিনি মেয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে চান না। এই দুঃসময়ে সোনালীর কাছে থাকা কারো দরকার। এবং এই প্রথম বুঝলেন, সোনালীর পরিণতি সম্পর্কে দ্বিতীয় আর কেউ নেই যাকে সাক্ষী রাখা চলে। এমন কি তার মাও নয়। তার মা জানলে, চোখ টান টান করে বলবে, আমি জানতাম এমন হবে। এই কথার আভাসে কতদূর কথাটা ছুড়ে দেওয়া যায় তাও তার জানা। বাপ যেমন আর কি! তার প্রতি যে অবিশ্বাস সোনালীর মা'র রয়েছে, সেটা এতদিনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তারপর তিনি অন্য কিছু কথাবার্তা বললেন। এই যেমন পুলিসের গুলি, ইরাক-ইরাণ যুদ্ধ,. যুদ্ধটা কেন, সর্বত্র মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ। কখনও ভাষা, কখনও ধর্ম, কখনও জাতীয়তাবাদ। পৃথিবীতে কিছুই নিরপেক্ষ নয়। সব কিছু নিজের মত করে ভাবা। নিজের মত করে দেখা।

নিখিল এবং সোনালী দু'জনই চুপচাপ বাবার কথা শুনছে। ইরাণের শাহর সঙ্গে তাঁর একবার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল, তাও তিনি বললেন। এখান থেকে সরকারের প্রতিনিধিদলের প্রধান হয়ে একবার

সেখানে গেছিলেন। পারস্য সভ্যতার জাঁকজমকের কথাও বললেন। ইতিহাসের কিছু পাতা উল্টে গেলেন। নিখিলের মনে হল মানুষটি পৃথিবীর এত খোঁজখবর রাখে, অথচ নিজের বাড়ির অনেক কিছু সম্পর্কেই অজ্ঞ। এইসময় মানুষটিকে ভালবাসা যায় কি শ্রদ্ধা করা যায় কিছুই বুঝে উঠতে পারল না নিখিল। এমন কথাবার্তা যে একেবারে আর দশটা দিনের মতো। তারপরই তিনি উঠে পড়লেন। যাবার সময় বললেন, তোমরা বেশী রাত কর না। সোনালী, তোমার শরীরটা ভাল নেই। সকালে যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে।

নিখিল এমন কথায় কেমন হতবাক হয়ে গেল। সকালের ভয়টা তবে কি আর তার নেই! তিনি কি তবে সোনালীর ইচ্ছাই পূরণ করবেন। বিয়ে হোক বা না হোক, সোনালী মা হবে! তিনি এতটা দায়িত্ব জীবনে হাসিমুখে গ্রহণ করার ক্ষমতা তবে রাখেন! তবে যাবার সময় বললেন, গুড নাইট মাই বয়েজ।

সোনালী বলল, আমার বাবা দারুণ। লাভলি!

নিখিল খুব সহজে কথার সঙ্গে সুর মেলাতে পারল না। সে শুধু বলল, হুম্।

—হুম্ কি নিখিলবাবু?

—না, মানে···

—বলুন, থামলেন কেন!

—আচ্ছা সোনালী, কুড়ি বছর পর যদি তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হয় তখন তুমি কি বলবে?

—কিছুই বলব না! কেন কুড়ি বছর পর কথাটা বললেন?

—যে আসছে, তার বয়স তখন উনিশ হবে ধরে নিতে পারি?

—তা হবে।

—সে কি তখন তোমার একাকীত্ব দূর করতে পারবে।

—আমি তাকে নিয়েই ত থাকব ভাবছি।

—তা হয় না সোনালী। তোমার বাবাও তাই চেয়েছিলেন। তোমার ঠাকুমাও তাই চেয়েছিলেন। তুমি কখনও বীজতলা দেখেছ?

—বীজতলা মানে!

—এই ধর ধান রোয়ার আগে বীজতলা করে নিতে হয়। বাঁধাকপি ফুলকপিরও বীজতলা হয়। সেই বীজতলার পাশে দাঁড়ালে গাছগুলোকে আলাদা করে চেনা যায় না। সবুজ কার্পেট হয়ে থাকে। তারপর তাদের আলাদা রোপন করে দিতে হয়—তখন ধরা যায় একটা গাছের সঙ্গে আর একটা গাছের পার্থক্য। সব গাছই নিজে বৃক্ষ হতে চায়। কেউ কারো ছায়ায় থাকে না।

—কিছুই বুঝলাম না। সোনালী এত স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে যে চমকে দেবার মত। চোখে মুখে সকালের বিষণ্ণতা অথবা বিকালের হাহাকার কণামাত্র লেগে নেই। অনেকদিন পর কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে যেমন কথাবার্তা হয় দু'জনে তেমনি কথাবার্তা।

নিখিল বলল, শৈশব হচ্ছে মানুষের বীজতলা।

—আপনি কি!

—কেন?

—এই শৈশব-টৈশব আসছে কেন?

—এই সময়টাতে মানুষ লেপ্টে থাকতে চায়।

—আমার কি শৈশব চলছে?

—বুঝতে পারছি না।

—তাহলে উঠুন। জামাকাপড় ছাড়ুন। আজ আমরা দু'জনে অনেক রাত জাগব। কোন কথা শুনব না।

—তার মানে!

—এই আমার যা কিছু আছে আজ আপনি দেখবেন!

নিখিলের কেমন শীত শীত করতে থাকল কথাটাতে। চোখ জ্বালা করতে থাকল। কথাটা সোনালী কি প্রসঙ্গে বলছে—তা সে বুঝছে না। তার আর কি আছে দেখবার! সে ত সবই দেখেছে। বাস থেকে নামিয়ে সে যখন তাকে হাত মুখ ধোবার জন্য নিয়ে গেছিল, তখন দেখতে কিছু বাকি থাকেনি! তারপরই সে ভাবল, আসলে সে নিজেও একজন কামুকের গন্ধ শরীরে বয়ে বেড়ায়। তা না হলে এমন সব ভাবছে কেন!

সোনালীর হয়ত কিছু দুর্লভ ছবি আছে, রেকর্ড আছে—সেইসব তাকে দেখাতে পারে, শোনাতে পারে।

নিখিল খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, তোমার আর কি বাকি আছে দেখাবার।

—চলুন না। পাশ ফিরে মুচকি হাসল সোনালী।

এমন টান টান চোখে একটা মেয়ে কি যে দারুণ হাসতে পারে। সারা শরীরে যেন সোনালীর এতটুকু দুর্বলতা নেই। এবং সোনালীর শরীরে কোন অদৃশ্য শক্তি ভর করছে যেন। প্রিয়জন এলে নারীর মধ্যে যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায় সোনালীর মধ্যে এখন তাই ফুটে উঠছে। বেশ দৌড়ে করিডোর পার হয়ে বলল, আসুন। আমরা আজ ছাদে বসে সারারাত আকাশ নক্ষত্র দেখব।

নিখিল বলল, পাগল নাকি তুমি।

—পাগলই বলতে পারেন। তবু আমার ভারি ইচ্ছে, অন্ততঃ একটা রাত দুজনে পাশাপাশি বসে থাকব। কোন কথা বলব না।

—কোন কথা না!

—বলব, মনে মনে।

—তারপর?

—তারপর দিব্যি থাকবে, আপনি কি ভেবেছেন, আমাকে বলবেন। আমি কি ভেবেছি, আপনাকে বলব।

—কতক্ষণ বসে থাকতে হবে?

—যখন মনে হবে আপনার চুপচাপ আর বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না তখনই কথা বলবেন।

—এ তো ভারি কঠিন ব্যাপার!

—বা রে, কঠিন কি। আমার সঙ্গে পাশাপাশি নিরিবিলি বসে থাকতে ভয় করে?

—না, বলছিলাম, তোমার শরীরটা ভাল নেই।

—কে বলল?

—কে বলবে আবার!

—খুব ভাল আছি। আপনি পাশে থাকলে আমার কিছু হবে না। কোন ভয় থাকে না।

নিখিল ছাদে উঠে দেখল একটা লম্বা ঘর এখানেও এক পাশে আছে। ঘরটার মধ্যে টেবিল টেনিসের বোড, দু-পাশে দাঁড়িয়ে অনেকটা জায়গা নিয়ে খেলার মত প্রশস্ত জায়গা। দেওয়ালে শ্রীমা এবং অরবিন্দের বড় বড় তৈলচিত্র দুটো। অনেক দূরে বল গড়িয়ে দিলে মার্বেল পাথরে আশ্চর্য ম্লান আবছা ছায়া। সোনালী টেনিস বলটা তুলে এদিকে এগিয়ে আসছে। হাতে টেনিস বল নিয়ে সোনালী শিশুর মত তাকিয়ে আছে নিখিলের দিকে।

নিখিল কি বলবে ভেবে পেল না।

সোনালী বলল, কী সুন্দর বলটা। নিরুপম আর আমি রাত জেগে খেলতাম। শ্রান্ত হলে, দু'জনই পাশাপাশি বসে থাকতাম। উত্তাপ সঞ্চার হত। উত্তাপ ভারি মনোরম জীবনে।

নিখিল হাটতে হাঁটতে টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল। অনেকদিন সাফসোফ হয়নি। ধুলোর আস্তরণ জমে আছে। আঙ্গুল তুলে দেখল, কালো ছাপ।

—কি দেখছেন!

জ্বল —কতদিন ধরে ময়লা জমছে?

ম —ব্যবহারে চাকচিক্য বাড়ে নিখিলবাবু।

সেই দূরবর্তী গলা, বলল ফের, আসুন। কেউ দুটো ইজিচেয়ার ছাদে পাশাপাশি রেখে গেছে। পাশাপাশি দুজনে বসার মত। একে অপরের ঘ্রাণ সহজেই পেতে পারে। চুলের সুবাস বয়ে বেড়ায়। এ-ভাবেই নিখিল সোনালীর হাতে টেনিস বল নিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল। আকাশ দীগন্তে নেমে গেছে। সবচেয়ে উঁচু বাড়ি বলে শহরের সব কিছু দৃশ্যমান। আলো, কোথাও অন্ধকার, কোথাও গ্রীন বেল্টের সবুজ আবছা ছায়া, কখনও অদূরে গাড়ির আলো।— আরও দূরে রেল-লাইন, গাড়ির হুইসেল এবং আকাশে পর্যাপ্ত নীল নির্জনতা।

ওরা কেউ কথা বলছিল না।

আকাশের গায়ে নিখিল দেখল এক হলুদ শস্যক্ষেত্র। দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে সে এবং আর কেউ হেঁটে যাচ্ছে। হলুদ ফুলের কেশর উড়ে আসছে—প্রজাপতির মতো পাঁপড়িরা ঢেউ তুলছে। যেন নাচছে হাসছে। কুয়াশা ভেজা ঘাসের মাঝে মাঝে মুক্তোর মতো শিশিরবিন্দু। সে হেঁটে যাচ্ছিল পাশে আর কেউ হাঁটছিল। তাকাতেই দেখল, সোনালী খিল খিল করে হাসছে, আর জনিং করছে। হাত বাড়িয়ে, হাওয়ায় পাখা মেলে দেবার মতো উড়ে আসছে। কোথা থেকে এল দস্যুর মতো হাওয়া। উড়িয়ে নিয়ে গেল সোনালীর সর্বস্ব। সোনালী এবং সে ক্রমে জলের ঘূর্ণির মতো লেপ্টে যাচ্ছে।

সোনালী দেখছে আকাশে কোন নক্ষত্র নেই মনে হচ্ছে ওখানে সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং নদী--পাশে কোন আশ্রম। গাছপালা পুকুর—এক ছোট্ট শিশু দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। সে আশ্রমে কাঠকুটো এনে, নদী থেকে জল এনে রাতের আহার তৈরিতে ব্যাপ্ত। গোয়ালে গরুটা হাম্বা করছে। মানুষটা গেছে নদীর ওপারে—কথা আছে সে আজ নিয়ে আসবে শিশুর জন্য বই এবং স্লেট। মানুষটার হয়ে সে পৃথিবীকে ছিমছাম রাখার দায়িত্ব পালন করছে।

নিখিল হঠাৎ কাশতে থাকল।

সোনালী বলল, কি হল !

নিখিল কোনরকমে বলল, বিষম লেগেছে।

—ঠাণ্ডা লাগবে। চল, শুই গিয়ে। শুয়ে শুয়ে তোমার কথা শুনব। এতক্ষণ কি ভাবলে বলবে।

সোনালী নিচে নেমে বলল, এখানে তুমি শোবে।

পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে বলল, এখানে আমি, দরজা খোলা থাকবে। যেন তোমার কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তে পারি। তখন তুমি খুব নিঃশব্দে চলে যাবে। এতটুকু আওয়াজে ঘুম ভাঙলে, আমার কিন্তু আর ঘুম আসবে না। আমি মরে যাব।

নিখিলের সামনেই বিছানায় সোনালী কাত হয়ে শুল। দু-হাত

বিছিয়ে রেখেছে। আঙ্গুলগুলি মাখনের মতো নরম। স্তন ভারি পুষ্ট। পেট থেকে অন্যমনস্কতার দরুণ শাড়ি কিছুটা উঠে এসেছে।

—এবারে বল। সোনালী শুনতে চাইল।

নিখিল তার হলুদ শস্যক্ষেত্রের কথা বলল। ঘূর্ণি জলে লেপ্টে যাওয়ার কথা গোপন করে গেল।

সোনালী বলল, তুমি প্রবঞ্চক নিখিল।

—কেন এ-কথা বলছ!

—দিব্যি রাখনি।

নিখিল বলল, বলতে সংকোচ হয়, আমি পারি না।

—বল স্বাধীন নও তুমি। ইচ্ছের কথা গোপন করে যাও। স্বাধীনতার স্বাদ বোঝ না তুমি।

নিখিলের কেন জানি কম্প দিয়ে জ্বর আসছে, চোখ জ্বালা করছে—সোনালী যে-ভাবে শুয়ে আছে হাত-পা ছড়িয়ে—সে আর কিছুতেই পারছে না। সে বলল জল খাব।

সোনালী উঠে গিয়ে রুপোর গ্লাসে জল নিয়ে এল। হাত বাড়াবার সবুর সইলো না। নিখিল ক্রমে শ্লথ এবং কামার্ত যুবকের মতো সোনালীকে জড়িয়ে ধরল। সোনালী ভেতরে ভেতরে শিখা হয়ে জ্বলছিল—আসলে নিখিলের সারল্য কামের উদ্রেক করছে; তার দু উরুর মাঝে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা এ সময়ে তাকে জ্বালিয়ে ছারখার করছিল—সবই কেমন শীতল অবগাহনে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মুহূর্ত মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়। মুহূর্ত মানুষকে কখনও এক দিব্যজগতে পৌঁছে দিতে পারে, নিখিলের এর আগে জানা ছিল না। পৃথিবীটা এই রকমের। বিবাহ এবং সংস্কার সব মূল্যহীন। আসলে ফুলে-ফলে পৃথিবী ধরে রাখে কোন অদৃশ্য দেবদূত। তার কাজই শুধু আবদ্ধ করা। মা-বাবা ভাই-বোন, অন্য এক প্রবাসী জীবনের খবর যেন। নারীই তাকে শৈশব থেকে এতদূর পথ হাঁটিয়ে এনেছে। সে নারী মা হয়। সে নিমিত্ত মাত্র। সোনালীর জাতক—তার কাছে এখন আর এক প্রেমিক। তার জন্মের সঙ্গে, নতুন ভালবাসার অপেক্ষা। যা সে এবং সোনালী অথবা

নিরুপম এবং পৃথিবীর তাবৎ পুরুষ রমণীরা আদম ইভের যুগ থেকে করে আসছে।

সোনালী উঠে বসলে নিখিল কেমন অপরাধীর মতো তাকিয়ে থাকল।

সোনালী মাথায় হাত রেখে বলল, আমরা এই নিখিল। ভেব না।

নিখিল বলল, আবার দেখা হবে ত?

—হবে। যখন খুশি আসবে, হবে।

নিখিল বলল, আমিই ওর বাবা। তুমি ওর নাম আমার সঙ্গে মিলিয়ে রেখ।

সোনালী নিখিলের মুখ দেখে বুঝল সেখানে কোন গ্লানি নেই। মানুষটা তার সামনে অতিকায় পুরুষ হয়ে যাচ্ছে। নারী আজীবন এই চায়। সোনালী বলল, আমার পাশে শুয়ে থাক। তুমি কাছে না থাকলে আমি যে সাহস পাই না। আমার সন্তানের বই স্লেট তোমার যে এনে দেবার কথা।

নিখিল আর কোন কথা না বলে কুঁকড়ে শুয়ে থাকলে সোনালী একটা রঙিন চাদর এনে গা ঢেকে দিল। যেন তার এও এক দ্বিতীয় সন্তান।

—শেষ—